পাতায় পাতায়
ছন্দে আনন্দে পৃষ্ঠা ২
ভূত গল্প (২) পৃষ্ঠা ৪
ধারাবাহিক উপন্যাস পৃষ্ঠা ৮
ইচ্ছেডানা পৃষ্ঠা ১৪

কিচির মিচির

পাতায় পাতায়
ভূত গল্প (১) পৃষ্ঠা ৩
ভূত গল্প (৩) পৃষ্ঠা ৫
মানুষ হতে হবে পৃষ্ঠা ১১
মঙ্গলাভিযান পৃষ্ঠা ১৩
দেবীবরণ পৃষ্ঠা ১৬

১ বর্ষ ১ সংখ্যা | ১৬ অক্টোবর ২০১৪, ২৯ আশ্বিন ১৪২১ | মোট ১৬ পাতা মূল্য : ১০ (দশ) টাকা

ভূত চতুর্দশী স্পেশাল

এবারে অতিরিক্ত ৪ পাতা
মোট ১৬ পাতা

ভূত নিয়ে জমজমাট ছড়ায় গল্পে উপন্যাসে

দৈতা হাজরা গোস্বামী, শঙ্কর দেবনাথ, আকিব সিকদার, সুশান্ত বরাট, তাপসকিরণ রায়

দেবার্চন বসু, শুভেন্দু ঘোষ, সহেলী চট্টোপাধ্যায়, প্রোজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়,

ভূত নিয়ে আছে ছোটোরাও

এবং বিবেক কুণ্ডু

ভূত উপাখ্যান

দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

গেছো ভূতের কাণ্ড

আসলে সে মেছো
মাছ খেতে তার আপত্তি তাই
গাছেই থাকত গেছো
কাণ্ড দেখো তার
তালের বড়া চাখতে গিয়ে
জিভ পুড়ে ছারখার।

ভূতের বাড়ি

হাতছানি দেয় অন্ধকারে
একলা ভূতের বাড়ি
দাঁত খিঁচিয়ে চোখ পাকিয়ে
জানলা সারি সারি
ভূতেরা সব বাদুড় ঝোলা
কড়িকাঠের গায়ে
ব্রহ্মদত্যি সতি সত্যি
হাঁটে খড়ম পায়ে
দারোয়ানটা স্কন্ধকাটা
করে সে পায়চারী
হাতছানি দেয় অন্ধকারে
ফোকলা ভূতের বাড়ি।

তিনটে ভূতের ছানা

তিনটে ভূতের ছানা
অন্ধকারে গান জুড়েছে
তা না না না না না
খোনা গলায় চিকন সুর
উঠছে কেঁপে রাত-দুপুর
ওদের বাড়ি আঁধারনগর, শ্যাওড়াগাছি, ভূতুমপুর

অঙ্কন : দ্বৈতা হাজরা গোস্বামী

চামচিকা ভূত

আকিব শিকদার

মাঝ রাত গায়ে হাত
দিল কে রে?
জানালাটা খিল আঁটা
পর্দাটা কেঁপেছে রে।
ভূত নাকি আয় দেখি
কাছে আয়!
চামচিকা ঝেড়ে পাখা
উড়ে যায়।

সাহসি পিসে

সুশান্ত বরাট

যত সব অদ্ভুতুরে
মন গড়া আজগুবি ঢপ
কে বলে ভুত আছে রে
দেখি আয় সব বেয়াদপ।
শুনে তো খ্যাংড়াকাঠি
ইয়া বড়ো কালো নখর
ঝুলিয়ে দাঁতকপাটি
চুলকায় পেটের ভিতর।
ভয়েতে কাঁপছে পিসে
জপে যায় 'রাম রাম রাম'
রাতেতেই চম্প বাসে
ঘর ছেড়ে গোবিন্দধাম।

ছন্দে আনন্দে

ভূতগুলো সব শব মানুষের

শঙ্কর দেবনাথ

গভীর রাতে কেউ গেছো
কি শ্যাওড়া গাছের তলায়,
পেত্নী ভূতের গান শুনেছো
বিকট নেকো গলায়?

আমবাগানের মামদো ভূতের
পুতের নাচন-কোদন,
কেউ দেখেছো? কেউ শুনেছো
পেঁচোপেঁচির রোদন?

অমার রাতে কেউ দেখেছো
অশত্থগাছের শাখায়,
কেমন করে বেহ্মদত্যি
চোখ পাকিয়ে তাকায়?

কেউ কি জানো কেউ কী করে
সমস্ত রাত জুড়েই?
নিশির ডাকে কীসের ঘোরে
সবাই মরে ঘুরেই?

বিলের ঝিলের মাছ ধরে খায়
মেছোভূতের ছানায়,
উদ্ভুক্কুভূত কেমন ওড়ে
পালকবিহীন ডানায়?

মুন্ডুকাটা কবন্ধভূত
কেমন ভয়াল বেশেই,
রাত কাঁপিয়ে দাপিয়ে বেড়ায়
অট্টহাসি হেসেই?

দুই পা রেখে দু'তাল গাছে
গেছোভূতের কাকায়,
ফুঁকোয় হুঁকো কেমন করে
এবং মাথা ঝাঁকায়?

শাকচুন্নির ডাক শুনেছো
অন্ধকারে গাবের
ভূতের বিয়ে কেউ দেখেছো?
শ্রাদ্ধ ভূতের বাপের?

জানতে গেলে এসব তুমি
পড়বে বিষম গেরোয়,
ভূতগুলো সব শব মানুষের
রাত-বিরেতে বেরোয়।

কিসের সুর, ঝনঝনি?

তাপসকিরণ রায়

রাত দুপুরে, করুণ সুরে,
কে গো বাজায় বাঁশি
ক্লান্ত রাখাল, এমনি বেহাল
কোন খেয়ালে ভাসি?
তখনই চলল, দাদা বলল-
'দেখি কে ধরেছে তান।
গভীর রাতে, এমনি মাতে -
কার এ অভিমান।'
দাদাকে বলি, 'সঙ্গে আমি চলি,
লাগবে তোমার ভয়,
এমন অদ্ভুত, হতে পারে ভুত -
এ তো বাঁশির সুর নয়!'
এবার যেন বাজে, বেতাল এক ঝাঁঝে,
ঝাঁঝর ঘন্টা ধ্বনি,
সাথে মাদল। কিসের সে বোল?
কিসের সে ঝনঝনি?
এমনটা কী হয়। মাঝ রাতের লয়!
'চল না দাদা গিয়ে দেখি,
ওই দিকটাতে, সুর বাদ্যি মাতে -
সে কি আসল, না কী মেকি?'
বহুদূরে গিয়ে, পুকুর পেরিয়ে
ছাতিম গাছের নিচে,
দেখি কারা যেন - নাচে মত্ত কেন?
সারি দিয়ে পিছে পিছে।
'ওরে বাবা গো! সবাই জাগো,
ভূতদের এ আয়োজন,
সাদা-কালো ছায়া, মোহময় মায়া,
এ ভালো নয়, কুলক্ষণ।'
নতুবা এত রাতে, ভুত ছাড়া কোন জাতে,
করবে হুলস্থুল?
বাদ্য যন্ত্র সব, করে ওঠে রব,
নির্ঘাত ভূতপ্রেত কুল।
গ্রামের সবাই,' বলে একি ভাই,
কেন হই হল্লা রব?
ভীত যেই জন, দুর্বল মন,
বলে, প্রেতের উৎসব।'
সাহসি যে জন, সাহস ভরে কন-
'দেখি কিসের এ আসর?'
আদিবাসী জনের, আনন্দ ক্ষণের
বসেছে বিবাহ বাসর।।

বেগমপুরের বাঘা

দেবার্চন বসু

জিনিসটা সাজিয়ে রাখা ছিল বৈঠকখানার দরজার মাথায়, দেওয়ালের গায়ে। দেখে ফুচাইতো এক্কেবারে থ'। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল, ওর দিদিভাইও গোলগোল চোখে জিনিসটাকে দেখছে।

বাপ রে! কী দেখতে। ইয়া বিশাল একটা বাঘের মুখ, অবিকল আসলের মতন। জ্বলজ্বলে দু'টো চোখ। কী ভয়ঙ্কর চাহনি— যেন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। এখুনি দেওয়াল ছেড়ে ওদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়ে।

এতক্ষণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে সৌমিত্রকাকু মজা দেখছিলেন। এবার ওদের দিকে এগিয়ে এসে হাসি হাসি মুখে বললেন, এগুলোকে কি বলে জানো তো ফুচাই? বলে ট্রোফি। শিকারিরা শিকার করার পর মৃত জন্তুর শরীর থেকে চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে সেটাকে এক ধরনের কেমিক্যাল সলিউশনে কিছুদিন ডুবিয়ে রাখেন। তারপর কাঠ বা মাটি দিয়ে জন্তুটার একটা পুতুল বানিয়ে তার গায়ে সাঁটিয়ে দেওয়া হয় চামড়াখানা। ব্যাস, হয়ে গেল ট্রোফি।

ফুচাইয়ের বাবা পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু সৌমিত্র তোমাদের বাড়িতে এ জিনিস কোত্থেকে এল? তোমাদের বংশে কেউ শিকারি-টিকারি ছিলেন নাকি?

— ছিলেন বৈকি। আমার জ্যাঠামশাই, একেবারে শিকার পাগল মানুষ। এ-সব তো ওঁনারই কীর্তি।

শুনে ফুচাইয়ের দিদিভাই আদুরে গলায় বলল, তাহলে কাকু তুমি নিশ্চয় অনেক শিকারের গল্প-টল্প জানো। একটা দু'টো বলো না প্লিজ।

সৌমিত্রকাকু হাত তুলে নিরস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, সে সব পরে হবে'খন। তোমরা অনেক জার্নি করে একটু আগে এসে পৌঁছেছো। এখন চান-টান করে খাওয়া-দাওয়া করো, একটু রেস্ট নিয়ে নাও। গল্প সন্ধেবেলা বলব।

ক'দিন আগেই স্কুলে গরমের ছুটি পড়েছে। ফুচাই তাই ওর বাবা-মা আর দিদিভাইয়ের সঙ্গে এই বেগমপুরে সৌমিত্রকাকুদের বাড়ি বেড়াতে এসেছে। সৌমিত্রকাকু ওর বাবার বন্ধু। এক সময়ে ওঁনারা নাকি এখানকার মস্ত বড় জমিদার ছিলেন।

জায়গাটা ফুচাইয়ের বেশ লাগছে। চারপাশে কত গাছ, আম-জাম-আতা-পেয়ারা। আর বড়ো বড়ো পুকুর-দিঘি—সেখানে হাঁস চড়ে বেড়াচ্ছে। পুকুরের ঘাটে অজস্র সাদা-হলুদ রঙা ফুল। মাথার উপর গাছের ডালের ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুকরো যেন জমাট বেঁধে আছে। সৌমিত্রকাকুদের বাড়িটাও রাজবাড়ি রাজবাড়ি দেখতে। সামনে পেছনে পাঁচিল ঘেরা বাগান। সেখানে গাছগাছালির জটলা, তলায় ঘন আগাছার জঙ্গল।

সন্ধেবেলা বৈঠকখানাতেই বসল গল্পের আসর।

দেওয়ালে ঝোলানো ট্রোফিটাকে দেখিয়ে সৌমিত্রকাকু বলছিলেন, সে আজ থেকে পঞ্চাশ-বাহান্ন বছর আগের কথা। জ্যাঠামশায়ের কানে এল, হাজারিবাগের কাছে একটা গ্রামে একটা ম্যান-ইটার বাঘ রাতের দিকে হানা দিচ্ছে। গরু-ছাগল টেনে নিয়ে যাচ্ছে, এমনকি দু'-তিনটে মানুষকেও অলরেডি নাকি খতম করা হয়ে গেছে। গ্রামের মানুষ বাড়ি থেকে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না। বাঘটা হয়ে উঠেছিল ওই অঞ্চলের ত্রাস। জ্যাঠামশায়কে খবরটা দিয়েছিলেন মহিষাদল রাজবাড়ির কোনো এক কর্তা। দু'জনে খুব বন্ধু ছিলেন কী না। তো, দুজনে মিলে একদিন হাজির হলেন হাজারিবাগে। গাছের উপর মাচান বাঁধা হল। মাচানের তলায় গাছ থেকে একটু দূরে বেঁধে রাখা হল একটা ছাগল।

ক্রমেই জঙ্গলে রাত নেমে এল। যেই না ছাগলের লোভে বাঘ এসে চড়াও হয়েছে মাচানের কাছাকাছি, অমনি গুড়ুম শব্দে গর্জে উঠল বন্দুক। ব্যাস এক গুলিতেই কেল্লা ফতে। ওই অতবড়ো তাগরাই চেহারা নিয়ে মাটিতে মুখ থুবরে পড়ল হাজারিবাগের ম্যান-ইটার। গ্রামের লোকজনের তো খুব আনন্দ। তারা বাঁশের মাচান বানিয়ে তার উপর বাঘটাকে শুইয়ে হেঁইও হেঁইও করতে করতে নিয়ে চলল গ্রামে। তারপর সারারাত ধরে চলল খানাপিনা নাচাগানা।

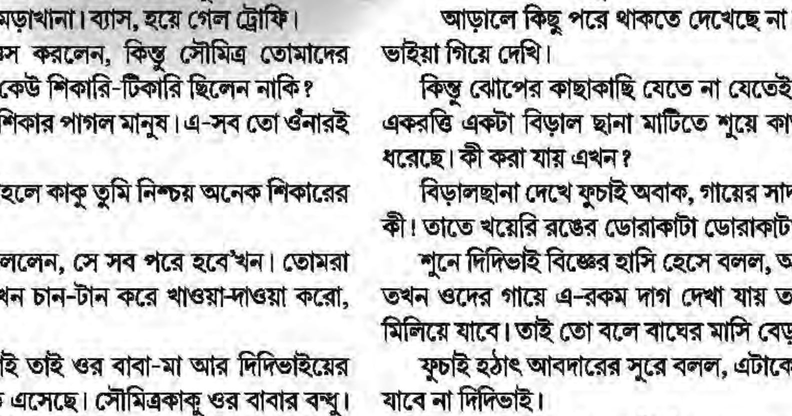

এই হল গল্প। তবে একটা কথা না বললেই নয়। বাঘটা ছিল মা-বাঘ, মানে বাঘিনী। জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি তার সঙ্গে ছিল তার ছানা। বাঘটাকে যখন মারা হয় তখন ছানাটা নাকি ঝোপের ধারে চুপটি করে বসেছিল।

দারুণ জমাটি গল্প, ফুচাই ভাবছিল, স্কুল খুললেই বন্ধুদের গিয়ে বলতে হবে। তবে বাঘ ছানাটার কথা মনে হতেই তার বুকের ভেতরে ভারি কষ্ট হচ্ছিল, না না, ভারি অন্যায় কথা, একটা মা-বাঘকে এভাবে মেরে ফেলার আগে তার বাচ্চাকাচ্চার কথা কেউ একবার ভেবে দেখবে না?

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর এ-সব ভাবতে ভাবতেই দুষ্টু ফুচাই কখন যে মা কে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তা সে নিজেই জানে না।

কতকগুলো কাক একটা ঝোপের দিকে তাকিয়ে তারস্বরে কা-কা করছিল—

পরেরদিন সকালের কথা, ফুচাই তখন ওর দিদিভাইয়ের সঙ্গে সৌমিত্রকাকুদের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাখি দেখছে। প্রজাপতি ধরছে।

কা-কা শুনে দিদিভাই থমকে দাঁড়িয়ে পরে বলল, কাকগুলো নিশ্চয় ঝোপের আড়ালে কিছু পরে থাকতে দেখেছে না হলে এ-ভাবে তো চেঁচানোর কথা নয়। চ'তো ভাইয়া গিয়ে দেখি।

কিন্তু ঝোপের কাছাকাছি যেতে না যেতেই দিদিভাই তো হাঁউমাঁউ করে উঠল, ও মাগো। একরত্তি একটা বিড়াল ছানা মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। আহা রে, বেচারাকে পিঁপড়ে ছেঁকে ধরেছে। কী করা যায় এখন?

বিড়ালছানা দেখে ফুচাই অবাক, গায়ের সাদা লোমগুলো বাতাসে ফিরফির করছে। কিন্তু এ কী! তাতে খয়েরি রঙের ডোরাকাটা ডোরাকাটা দাগ, তা কী করে হয়?

শুনে দিদিভাই বিজ্ঞের হাসি হেসে বলল, আরে বুদ্ধু, বিড়ালছানারা যখন খুব ছোটো থাকে তখন ওদের গায়ে এ-রকম দাগ দেখা যায় তারপর একটু বড়ো হলে ও-সব আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাবে। তাই তো বলে বাঘের মাসি বেড়াল— শুনিস নি কথাটা?

ফুচাই হঠাৎ আবদারের সুরে বলল, এটাকে বাড়ির ভিতর না নিয়ে যেতে পারলে বাঁচানো যাবে না দিদিভাই।

কিন্তু মা জানতে পারলে পিঠের ছাল তুলে নেবে, দিদিভাই আঁতকে উঠে বলল।

ফুচাই রাগে গজগজ করা শুরু করল, তোমার তো সবেতেই ভয়। ভিতুর ডিম কোথাকার। এ বাড়ির ছাদে একটা চিলেকোঠার ঘর আছে, আমি আজ সকালবেলা গিয়ে দেখে এসেছি। ওখানে নিয়ে গিয়ে বিড়ালছানাটাকে রাখতে পারলে কে দেখতে পাবে?

আর শোনো, চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ফুচাই ফিসফিস করে আরো বলল, আমি একে কোলে নিয়ে ছাদে যাচ্ছি। তুমি পারলে রান্নাঘর থেকে একটু দুধ আর বিস্কুট ম্যানেজ করে নিয়ে ছাদে এসো।

এরপর সারাটা সকাল ফুচাই বেশ খুশিয়াল মুডেই কাটাল। লাকটাও দারুণ ফেভার করেছিল, না হলে চিলেকোঠার ঘরে গিয়েই হাতের কাছে পেয়ে যায় একটি ঢাউস মার্কা পিচবোর্ডের বাক্স? তারমধ্যেই তো বিড়ালছানাটাকে আলতো করে শুইয়ে তাকে দুধ আর বিস্কুট খাওয়ানো হল। তাই দেখে ফুচাইতো খিলখিল করে হেসেই অস্থির, হি-হি, বেড়ালছানা দুদু খায় চুক-চুক-চুক।

তবে ঘটনাটা ঘটল ঠিক দুপুরবেলা।

ওদের থাকার জন্য সৌমিত্রকাকু দোতলার পাশাপাশি দু'টো ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন। একটা ছাদে যাবার সিঁড়ির পাশে, অন্যটা একটা ঘর ছেড়ে দোতলার বারান্দার আরো ডান দিকে। খাওয়াদাওয়া করে মা আর দিদিভাই তখন ডানদিকের ঘরে ঘুমোচ্ছে। আর ফুচাই তখন সিঁড়ির পাশের ঘরটাতে। সোফায় শুয়ে টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল দেখছিল।

হঠাৎই গন্ধটা তার নাকে এল। একটা বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধ। ফুচাই যদিও ছোট্টো ছেলে— ক্লাস টু তে পড়ে, কিন্তু বুকে ওর ভীষণ সাহস। সে ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, গন্ধটা কোথা থেকে আসছে? ছাদের দিক থেকে কি? বুকটা তার আনচান করে উঠল, ছাদেরই এক কোনে তো চিলেকোঠার ঘর। সেখানেই তো শুইয়ে রেখে এসেছে বিড়ালছানাকে। তবে কি তার কোনো বিপদ ঘটল? নাহ.... এখানে দাঁড়িয়ে থেকে শুধুমুদু টাইম ওয়েস্ট করার কোনো মানেই হয় না। ছাদে যেতে হলে আভি যানা চাহিয়ে। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকল

(এরপর ৬ পাতায়)

শেষ খেয়া

শুভেন্দু ঘোষ

অঙ্কন : তপন চক্রবর্তী

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পা দিয়েই যতীনবাবু বুঝতে পারলেন, জীবনে এমন ভুল তিনি খুব বেশি করেননি। চারদিক প্রায় শুনশান। হাতে গোনা দু-চারজনকে যা চোখে পড়ল, তারা সবাই মনে হচ্ছে স্থানীয়। স্টেশনের আলোগুলো জ্বলছে বটে, তার বাইরে এই ছোটো মফস্বল শহরটা প্রায় অন্ধকার। এই রাতে আর রিকশা পাওয়া যাবে বলে তো মনে হয় না। তাতে তো নিস্তার নেই। এখান থেকে রিকশা নিয়ে প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তা পেরিয়ে খেয়াঘাটে পৌঁছাতে পারলেও শেষ খেয়া পাওয়ার আর কোনো সুযোগ নেই।

প্ল্যাটফর্মের বাইরে রাস্তায় এসে সত্যিই রিকশা পাওয়া গেল না। অগত্যা হাঁটা। একটা চায়ের দোকানের দোকানি তো ঝাঁপ ফেলবার আয়োজন করছিল। যতীনবাবু তার কাছ থেকেই খেয়াঘাটের নিশানাটা আন্দাজ করে নিলেন। কিন্তু সেইসঙ্গে লোকটি তাঁকে এই রাতটুকু প্ল্যাটফর্মে কাটাবার পরামর্শ দিল। এই জলকাদা ভর্তি রাস্তা পেরিয়ে এত রাতে খেয়াঘাটে পৌঁছেও লাভ হবে না। তাছাড়া পথে ঘাটে চুরি-ছিনতাইয়েরও তো ভয় আছে।

কিন্তু যতীনবাবুর আজ যেন মাথায় ভূত চেপেছে। এতদুর যখন এসে পড়া গেছে, তখন আর একটু এগোনো যাক।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন তিনি। আগরপাড়া থেকে বাঁশবেড়িয়া গিয়েছিলেন ছোটো শ্যালকের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। খাওয়া-দাওয়া তাড়াতাড়ি সেরে ফেলেছেন। কারণ না বেরোলেই নয়। পরদিন অফিস। সেই খিদিরপুর। তাই আগের রাতটা ঘুম ভালো না হলে চলে না যতীনবাবুর। আর সেটা নিজের বাড়িতেই হওয়া চাই। বেয়াই—বেয়ান—সম্বন্ধী—শ্যালক সকলেই রাতটুকু কাটিয়ে যাবার জন্য প্রায় হাতে-পায়ে ধরতে বাকি রেখেছেন। কিন্তু তাঁরাও যতীনবাবুর গোঁয়ারতুমির সাথে পরিচিত। শেষটায় স্ত্রী-ছেলেমেয়েদের সেখানে রেখে বাড়ি ফেরার পথ ধরেছিলেন যতীনবাবু।

রাত ন'টা নাগাদ ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ডাউন ব্যান্ডেল লোকালে উঠেও পড়েছিলেন তিনি। জানলার ধারে এককোণে বসার জায়গা পাওয়ার পর নিজের বিচার বিবেচনার ওপর একটা আস্থাও বোধহয় জন্মেছিল যতীনবাবুর। গাড়ি ছাড়ার কিছুক্ষণ পর ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর ভেজা হাওয়া শরীরে ঝাপটা দেওয়ার পর জানালার কাচটা নামিয়ে দিলেন। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক ছিল। গোল বাঁধল ভদ্রেশ্বর স্টেশন ছাড়ার পর। কী একটা কারণে যেন গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল মাঝরাস্তায় অন্ধকারে। যতীনবাবু হাতের কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখলেন রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। মনে মনে হিসাব করে নিলেন রিষড়া স্টেশনে নেবে খেয়াঘাটে পৌঁছে যাবেন সাড়ে দশটার মধ্যেই।

তারপর ঘাট পেরিয়ে খড়দহ পৌঁছে গেলে আর চিন্তা নেই।

যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে, তখনো মোবাইল ফোনের যুগ আসেনি। লোকাল ট্রেনের আধঘণ্টা দেরিতে চলা নিত্যযাত্রীদের গা-সওয়া। অল্প বৃষ্টিতেই ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

সুতরাং মিনিট পনেরো-কুড়ি দাঁড়িয়ে থাকার পরে গাড়ি যখন দুলকি চালে এগোতে থাকল, তখনই প্রমাদ গণলেন যতীনবাবু। বৈদ্যবাটি স্টেশন ছাড়ার পর প্রবল ধারায় বৃষ্টি শুরু হল। দশ মিনিট দুরের শ্রীরামপুরে যখন গাড়ি ঢুকল, তখন বৃষ্টির বেগ বোধহয় একটু কমল।

রিষড়া স্টেশনে নামার আগে ঘড়িতে চোখ রাখলেন, রাত্রি প্রায় এগারোটা। চায়ের দোকানির সতর্কবার্তা মাথায় নিয়ে খেয়াঘাটের দিকে পা চালালেন যতীনবাবু। যা থাকে কপালে—বর্ষার রাতে চারদিক প্রায় অন্ধকার আর নিঝুম। ল্যাম্পপোস্টগুলোও যেন ঝিমোচ্ছে। নির্জন গলিতে শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকা আর ব্যাঙের ডাক। পথে কোথাও কোথাও জলও দাঁড়িয়ে গেছে প্রায় হাঁটু অবধি। সুতরাং তাড়াতাড়ি হাঁটবার উপায় নেই। তারপর রাস্তায় যদি খানাখন্দ থাকে, তবেই হয়েছে আর কী! পোশাকের বিশেষ মায়া না বাড়িয়ে যতীনবাবু খেয়াঘাটের পথে এগোতে থাকলেন।

জি টি রোড পেরিয়ে সামান্য এগোলেই খেয়াঘাট। যতীনবাবু যখন সেখানে এসে পৌঁছলেন, টিপটিপ করে আর একদফা বৃষ্টি শুরু হল। সামনেই উত্তাল গঙ্গা। ভেজা হাওয়া গায়ে ঝাপটা মারছে বারবার। মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশ থেকে চুঁইয়ে আসা আবছা আঁধারে যতীনবাবু ঠাহর করার চেষ্টা করলেন, যদি একটা খেয়া পাওয়া যায়! না হয় দুটো পয়সা বেশিই যাবে। তবু যদি....। যতীনবাবু পায়ে পায়ে এগোলেন পারঘাটের কাঠের তক্তার উপর দিয়েই। ঠিক এই সময়ই একটা দমকা হাওয়ায় তাঁর ছাতাটা গেল উল্টে। বিপত্তির আর শেষ নেই! ছাতা সামলাতে সামলাতেই তাঁর চোখ চলে গেল ডানদিকে। ওখানে একখানা নৌকা না! ঘাটের পাশেই।

এতক্ষণ অন্ধকারে বোধহয় চোখে পড়েনি। যাক বাবা, একটা আশার আলো দেখা যাচ্ছে। যতীনবাবু এগিয়ে গেলেন সেদিকে। কিন্তু মাঝি কোথায়! এপারে আর কোনো খেয়া নৌকা চোখেও পড়ছে না। এই ঝড়বৃষ্টির রাতে মাঝিরা সব খেয়া পারে লাগিয়ে ছইয়ের তলায় নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজছে নিশ্চয়। কিন্তু সেগুলো একটাও এপারে কোথাও চোখে পড়লনা, শুধু ঐ একখানা।

প্রবল উত্তেজনায় যতীনবাবু আরো একটা জিনিস এতক্ষণ খেয়াল করেননি, যেটা এইমাত্র করলেন। একজন লোক। কাঠের তক্তাবসানো ঘাটের শেষপ্রান্ত যেখানে গঙ্গার জলের উপর থেমেছে

যতীনবাবু পায়ে পায়ে এগোলেন পারঘাটের কাঠের তক্তার উপর দিয়েই। ঠিক এই সময়ই একটা দমকা হাওয়ায় তাঁর ছাতাটা গেল উল্টে। বিপত্তির আর শেষ নেই! ছাতা সামলাতে সামলাতেই তাঁর চোখ চলে গেল ডানদিকে। ওখানে একখানা নৌকা না! ঘাটের পাশেই।

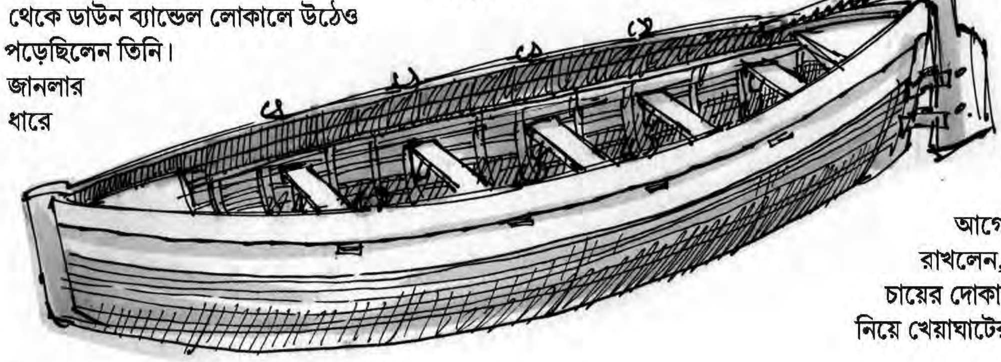

(এরপর ৬ পাতায়)

বিশুমামার ভূত দর্শন

প্রোজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়

ঋষভকে থামিয়ে দিয়ে বিশুমামা চিৎকার করে বলল, আলবাৎ ভূত আছে। উপল বলল, এতো দেখছি ভূতের মুখে রাম নাম। তুমি না একদিন বলেছিলে, যে ভূতপ্রেত বলে কিস্স্যু নেই। ভূত বনে আর মনে। এখন নিজেই স্বীকার করছ ভূত আছে। ব্যাপার কী বল তো? অর্ক বলল, ভূতের সঙ্গে মামার মোলাকাৎ হয়েছে নির্ঘাত।

বিশুমামা বলল, আমি তোদের বলেছিলাম না যেদিন নিজের চোখে ভূত দেখব সেদিন থেকে তাদের অস্তিত্ব মেনে নেব। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই ভূত মেনেছি বুঝেছিস।

ঋষভ বলল, তাহলে শোনাও না মামা, তোমার সেই ভুতুড়ে অভিজ্ঞতার কাহিনি। বিশুমামা বলল, গাড়ি সাড়ে তিনঘণ্টা লেট্ না করলে ভূত সম্বন্ধে আমার কোনো ধারনাই জন্মাত না। বেলা সাড়ে তিনটের জায়গায় ট্রেন থেকে নামলাম সন্ধে সাতটায়। এরপর সাইকেল রিকশা চড়ে তিনমাইল পথ পাড়ি দিয়ে যাব বন্ধু আনোয়ারের গ্রামের বাড়িতে। এর আগে যে দু'বার গেছি পৌঁছেছি বেলাবেলি। এবারেই তার ব্যতিক্রম। রিকশাওয়ালার সঙ্গে গল্প করতে করতে আর ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে দিব্যি এগিয়ে চললাম। দু'পাশে খাঁ খাঁ ধানক্ষেত। মাথার ওপর নক্ষত্রখচিত আকাশ। মাইল আড়াই পথ এগোনোর পর রিকশাওয়ালা বলল, বাবু, এবারে জোড়াবটতলা পেরোবো। বেশ জোরে জোরে রাম নাম করবেন আজ্ঞে।

আমি সহাস্যে বললাম, কেন হে, ভূতপ্রেত থাকে নাকি গাছে?

লোকটা বলল, মামদোভূত বাবু। বটগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে।

রিকশাওয়ালার কথা শুনে আমি জোরে জোরে হাসতে লাগলাম।

রিকশাওয়ালা বলল, হাসির কথা নয় বাবু। বটতলা এলেই টের পাবেন।

বললাম, ও তোমার চোখের ভুল। কী দেখতে কী দেখেছ। রাতের বেলা অমন অনেক কিছুকে মানুষের ভূত বলে ভ্রম হয়।

রিকশাওয়ালা বলল, ভ্রম নয় বাবু। অনেকেই দেখেছে। দর্শন আপনারও হবে। বটতলার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি। রাম নাম শুরু করে দিন। রিকশা নিয়ে ঠিক আমি বেরিয়ে যাব।

আমি শ্লেষের সুরে বললাম, লম্বা হাত বার করে ঘাড় মটকে দেবে নাতো হে তোমাদের ভূত?

রিকশাওয়ালা বলল, বাবু, এবারে জোড়াবটতলা পেরোবো। বেশ জোরে জোরে রাম নাম করবেন আজ্ঞে।
আমি সহাস্যে বললাম, কেন হে, ভূতপ্রেত থাকে নাকি গাছে?
লোকটা বলল, মামদোভূত বাবু। বটগাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে।

রিকশাওয়ালা বলল, আজ্ঞে পর্যন্ত কাউকে মটকাতে শুনিনি। আমি তো প্রায়ই রাত করে রাম নাম জপতে জপতে ঘরে ফিরি রিকশা নিয়ে। মাঝে মধ্যে শুধু মাংস, মাছের 'অর্ডার' করে। ঘুষ দিয়ে প্রাণ বাঁচাই। জোড়াবটতলায় রিকশা আসতেই তেরছা ভাবে একবার ওপর দিকে তাকিয়ে সড়াৎ করে চোখ নামাই। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পাই গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকা একটা অশরীরী শরীরকে।

জায়গাটা পেরিয়ে যাবার পর প্যাডেল মারতে মারতে রিকশাওয়ালা বলল, রসগোল্লার হাঁড়িটা ঠিক আছে তো বাবু?

রিকশাওয়ালার কথায় সম্বিত ফেরে। পাশে রাখা হাঁড়িটা সত্যি নেই।

গ্রামে ঢুকে দেখি চারধার বেশ শুনশান। ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। বাঁশবনে আলোর পশরা সাজিয়েছে জোনাকির ঝাঁক।

ঘরের দরজায় নক্ করতেই বন্ধ কপাট খুলে বেরিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালেন আনোয়ারের বৃদ্ধা পিসি। হেঁট হয়ে প্রণাম করতে যেতেই দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, থাক থাক, পা ছুঁতে হবে না।

বললাম, বহুদিন আনোয়ারের খবর পাই না। কেমন আছে সে?

পিসি কেঁদে ফেললেন।

বললাম, আহা, কাঁদছেন কেন, কী হয়েছে আনোয়ারের?

পিসি ধরা গলায় বললেন, আনোয়ার বেঁচে নেই। নিজের কানকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। অবাক বিস্ময়ে বললাম, মারা গেল কী ভাবে?

পিসি বললেন, বাইক অ্যাক্সিডেন্টে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে জোড়া বটগাছে। মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে বেঘোরে প্রাণ খোয়ালো ছেলেটা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে শুয়েছি। ঘুমটা সবে ধরেছে। হঠাৎ পাশের ঘরে জোর তর্কাতর্কিতে ঘুমের দফারফা। তর্ক বেঁধেছে আনোয়ারের সঙ্গে তার পিসির। পিসি ঝেঁঝে বললেন, সব ক'টা রসগোল্লা তুই একা খেলি? আমার জন্য দু'চারখানা ফেলে রাখতে পারলি না। পেটুক কোথাকার।

আনোয়ার বলল, তুমি রসগোল্লা খাবে কী, তোমার না তিনশো'র ওপরে সুগার।

পিসি বললেন, সে যখন ছিল- ছিল। সুগারের ধারধারি নাকি আর। এখন তুইও যা আমিও তাই।

বাপরে, দু'জনেই এরা ভূত। এক লাফে তক্তপোশ থেকে নেমে দ্রুত বেরিয়ে পড়ি ঘর থেকে। ভাগ্যি আমাকে নজরে পড়েনি ওদের।

হুঁ...শি...য়া...র...

অন্ধকার পথে কানে ভেসে এল চৌকিদারের হুঁশিয়ারি। পরক্ষণে জোরালো আলো এসে পড়ল চোখে।

কে যায়?

লোকটা সামনে এসে দাঁড়ায়।

আমি আনোয়ারের বন্ধু আজ রাত্রেই এসেছি। সবিনয়ে জানাই।

মুখের ওপর থেকে টর্চের ফোকাস সরিয়ে চৌকিদার বলল, কাদের কাছে এসেছেন? আনোয়ার বা ওর পিসি দু'জনের কেউ-ই তো বেঁচে নেই।

বললাম, না জেনে এসে পড়ে কী বিপদের মধ্যেই না পড়েছিলাম। এত রাতে যাই কোথায় বলুন তো?

চৌকিদার বলল, আমার সঙ্গে আসুন। কাছেই আমার বাড়ি।

রাতের মত একটা নিরাপদ আশ্রয় মিলে যাওয়ায় মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম।

অঙ্কন: তপন চক্রবর্তী

শেষ খেয়া

(৪ পাতার পর)

যাত্রীদের ওঠা নামা করার জন্য, সেখানে গঙ্গার দিকে মুখ করে উবু হয়ে বসে আছে সে। পেছনে যতীনবাবুকে সে দেখতে পায়নি। যতীনবাবু মরিয়া হয়ে ডাক পাড়লেন — 'কে ও, মাঝি নাকি! যাবে ওপারে? কিছু বেশিই নিও....' উত্তরে অন্ধকারে মিশে থাকা ছায়ার মত শরীরটা উঠে দাঁড়াল, বলল — 'হ কত্তা, যাবেন তো ইদিকে আহেন'। যতীনবাবু যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। এত বাধা-বিঘ্নের পরে এত সহজ - সমাধান তিনি কল্পনাতেও আনেননি। ওপারে পৌঁছে গেলে মোটামুটি যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

এই অবস্থায় আরামের কথা না ভেবে যতীনবাবু পাটাতনেই বসতে যাচ্ছিলেন। মাঝি তাড়া লাগালো — 'বাইরে থাকবেন না, ভিতরে সেঁধিয়ে যান গে। বাইরে জল-ঝড়ের ঝাপট আইজ এট্টু বেশিই।' যতীনবাবু বললেন, 'না না থাক, যা অবস্থা — আর নতুন কী ভিজব!' বললেন বটে, কিন্তু করবেনই বা কী? পোশাকের সঙ্গে পকেটের মানিব্যাগে রাখা টাকাগুলোও বোধহয় ভিজে ন্যাতা হয়ে গেল। এখন মানে মানে বাড়ি ফিরতে পারলেই রক্ষে।

গঙ্গার দমকা হাওয়ার সঙ্গে মাঝির গলা ভেসে আসছে— 'এই তো আজ সন্ধেতেই নাও উল্টে চারজন ডুবে মো'ল।—সব অদেষ্ট। কী দরকার বাপু এই বাদলা বেলায় নাও চড়ার।' যতীনবাবুর বুকের মধ্যে এবার হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন। মাঝি বলে চলেছে— 'অনেক রাত অবধি লোকে এপারে ওপারে খোঁজাখুঁজি করল। কাল সকালে বোধহয় জল পুলিশ আসবে। কিন্তু মারা গেল, তারা তো আর আসবেনি।' মাঝির গলা বুজে গেল। যতীনবাবু যেন বাকশক্তি হারিয়েছেন। তিনি শুনতে পাচ্ছেন— 'হেই জোয়ান বয়স থিক্যা নাও বাইছি, এই প্রথমবার নাও পাল্টি খেল বাবু। ধর ধর গেল গেল করতে করতেই মেয়ে-মদ্দগুলো সব জলে পড়ল। নাও পাল্টি হতেই আমি পড়লাম জলে। একটু সাঁতরে পাশে সরে গেলাম। কিন্তু শেষরক্ষে করতে পারলুম কই কত্তা! জলের তলাতেই দু'হাতে আমার পায়ে লাগালো টান। সে মরণ-টান আর সামলাতে পারলুমনি।'

চমকে তাকালেন যতীনবাবু। মাঝি উল্টোমুখে ফিরে দাঁড় টানতে টানতে হাসছে। সেটা হাসি না ফোঁপানো গোঙানি কিছুই বোঝা যাচ্ছেনা। খেয়া এখন মাঝগঙ্গা পেরোচ্ছে। চারপাশ ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে অস্পষ্ট। ভিজে পোশাকে চাবুক মারছে ঠান্ডা হাওয়া। যতীনবাবুর শরীর কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। শেষ শক্তি সঞ্চয় করে মাঝিকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। মাঝি এবার পিছনে ফিরে তাকাল। রাতের অস্পষ্ট আঁধারে তার মুখটা ভালো করে দেখা গেল না। শুধু কোটরাগত চোখদুটিতে যেন আগুনে দৃষ্টি। — এরকম দৃষ্টি কি মানুষের হতে পারে! যতীনবাবু অনুভব করলেন তাঁর পা দু'টো যেন অবশ হয়ে আসছে। মনে হল, মাঝির সঙ্গে তার দূরত্ব যেন কমছে। অথচ এও দেখলেন, মাঝি কিন্তু সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে লগি ঠেলছে। তাহলে কেন জ্বলন্ত দৃষ্টিটা এত কাছে মনে হচ্ছে।

এক মুহূর্তের জন্য যতীনবাবুর মনে হল, তিনি কি পাগল হয়ে গেছেন। অথচ নিজের চোখে যা দেখছেন, তাকে অবিশ্বাস করেন কী করে! ইতিমধ্যে বৃষ্টির দাপট বোধহয় একটু বাড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পিছন দিকে জলে পড়ে যাওয়ার একটা 'ঝপ' করে শব্দ শোনা গেল। তার সঙ্গে নারী-পুরুষের একটা সম্মিলিত তীব্র আর্তনাদ আর সবকিছুকে ছাপিয়ে একটা পৈশাচিক পুরুষকন্ঠের তীব্র মর্মান্তিক চিৎকার শুনতে পেলেন যতীনবাবু। প্রায় মাঝগঙ্গায় প্রবল জলোচ্ছ্বাসে নৌকা এখন ভীষণ ভাবে দুলছে। যতীনবাবুর মনে হল, নৌকার আশেপাশে অনেকগুলি হাত যেন জলের ওপরে ভেসে ওঠার অন্তিম ইচ্ছায় বাতাসকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে। তীব্র আর্তরব যেন ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসের তেজ আরো বাড়ছে। ভীত উদ্বিগ্ন যতীনবাবু ততক্ষণে খেয়াল করেছেন, খেয়া নৌকায় এখন তিনি একা। মাঝি নেই। জ্ঞান হারাবার আগে যতীনবাবু অনুভব করলেন নৌকা ভীষণভাবে দুলছে।.......

পরদিন ভোরে খড়দহের খেয়াঘাটে একটা নৌকায় যতীনবাবুর অচেতন দেহ উদ্ধার করে স্থানীয় মানুষ আর পুলিশ। হাসপাতালে জ্ঞান ফেরার পর অবশ্য তাঁর 'গল্প' ক'জনে বিশ্বাস করেছে, জানা নেই।

অঙ্কন : তপন চক্রবর্তী

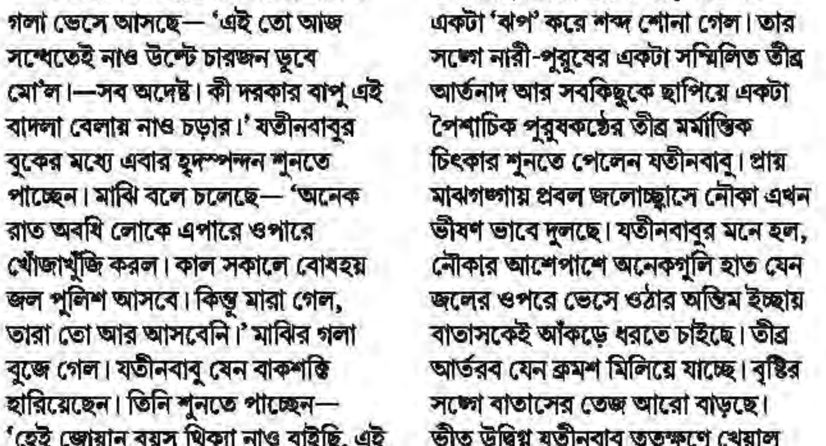

বেগমপুরের বাঘা

(৩ পাতার পর)

ফুচাই। কিন্তু চিলেকোঠার ঘরে পৌঁছেই ফুচাইয়ের চক্ষু চড়কগাছ। কোথায় সেই পুচকে বিড়ালছানা। এতো দেখছি বাঘের ছানা। প্রাণিটা পিচবোর্ডের বাক্সের বাইরে বেড়িয়ে এসে লেজ নাচাচ্ছে। সারা গায়ে তার হলদেটে লোম, তাতে কালো ডোরাকাটা ডোরাকাটা দাগ। মেঝের উপর লেজ আছড়িয়ে সে গমগমে গলায় বলল, এসো, আমি তোমারই ইন্তেজারে ছিলাম। ফুচাইয়ের তখন বুক টিপটিপ। কাঁচুমাচু গলায় জিজ্ঞেস করল, কেন? বিরক্ত গলায় বাঘের ছানা বলল, কারণ বড়োরা আমার কথা বিলিভ করবে না, ভাববে ভড়কি দিচ্ছি। তাছাড়া ওদের মনে জন্তু জানোয়ারদের জন্য দয়ামায়াও কম। কিন্তু তুমি দেখলাম একদম আলাদা। তোমার মনটা বড়ো নরম। কারুর কষ্ট দেখলে তোমার বুক ফাটে। আজ সকালে বিড়ালছানা সেজে আমিই ইচ্ছে করে কুণ্ডলি পাকিয়ে মাটিতে পড়ে ছিলাম। আসলে তোমাকে টেস্ট করছিলাম। তাতে অবশ্য তুমি পাস করেছ।

ফুচাই অতশত কথা বুঝতে না পেরে খাঁ করে বলে বসল, কিন্তু তুমি বিড়ালছানা থেকে হঠাৎ করে বাঘের ছানা হলে কী করে?...আর আমার নাম তো ফুচাই, তা তোমার নামটা কী?

খলখলিয়ে হেসে সে বললে, আমার নাম বাঘা। আর আমি ও-সব তেলকি-টেলকি দেখাতে পারি। ফুচাইয়ের গলা থমথমে, তুমি যে একটু আগে বলছিলে , বড়োরা তোমার কথা বিলিভ করবে না- কোন কথা?

—শুনবে আমার কথা। তাহলে শোনো। যদিও আমার স্টোরিটা খুব দুখের, তাও বলছি।

বহুবছর আগের কথা। সেটা ছিল ঘুটঘুট্টি অন্ধকারের এক সন্ধে। দু'জন শিকারি এসে হাজারিবাগের এক জঙ্গলে আমার মা'কে গুলি করে মারল। আমি তখন খুব ছোটো। শিকার করতেই শিখিনি। মা মরে যাওয়ার পর বনের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াতাম, কাঁদতাম। কেউ তো দেখার নেই, খাইয়ে দেবার নেই...। এইভাবে আমিও একদিন মরেই গেলাম। তারপর ভূত হলাম। বাঘাভূত। ভূতেরা ইচ্ছে করলে অনেক কিছু জানতে পারে। যেখানে খুশি যেতে পারে। তাই যেদিন আমি জানতে পারলাম আমার মায়ের মুণ্ডু দিয়ে ট্রোফি বানানো হয়েছে আর সেটাকে বেগমপুরের এই বাড়ির বৈঠকখানায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে, আমিও একদিন চলে এলাম এ-খানে। তারপর থেকে এত বছর ধরে নিজের মনে ঘুরে বেড়াই এই বাড়িতে, বাগানের আনাচে কানাচে। মাঝেমধ্যে মন কেমন করলে বৈঠকখানায় গিয়ে মা'য়ের মুখটা দেখে আসি.....। একি ফুচাই, তোমার চোখে জল?

সন্ধেটো যেই ঝপ করে নামল অমনি কারেন্ট অফ্‌। বৈঠকখানায় সবাই এসে হাজির। ফুচাই আজ নাকি কে না কে এক বাঘা তার গল্প বলবে সবাইকে। আলো বলতে তখন শুধু হ্যারিকেন। আর ট্রোফিটা? তাতে তখন শুধু আলো আঁধারের খেলা। হাত-পা নেড়ে ফুচাই বলে যাচ্ছিল বাঘার কথা, বাঘার মা'য়ের কথা। বড়োদের মুখে তখন মিটিমিটি হাসি, ছোটোরা কত কিছু বলে! কিন্তু ফুচাই খেয়াল করেছিল, দিদিভাইয়ের মুখ থমথমে। সে মাঝেমাঝেই ভয়ভয় চোখে ট্রোফিটার দিকে তাকাচ্ছিল। গল্প শেষ হতেই বড়োরা সব হো হো করে হেসে উঠলেন। সৌমিত্রকাকু তো বলেই বসলেন, ও মাই গড। ছোটোরা সত্যিই কল্পনার জগতে বাস করে। তাহলে আমাদের ফুচাই এই বেগমপুরে এসেও ভূত দেখছে। বাঘাভূত। তাও আবার দিনের বেলায়.....কিন্তু সৌমিত্রকাকু তাঁর কথা শেষ করে উঠতে পারলেন না কারণ হঠাৎই দিদিভাই ট্রোফিটার দিকে তাকিয়ে কী একটা দেখে অজ্ঞান। সকলেই তখন চমকে উঠে ট্রোফিটার দিকে ঘুরে তাকিয়েছে। সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। ট্রোফিটার দুচোখ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল।

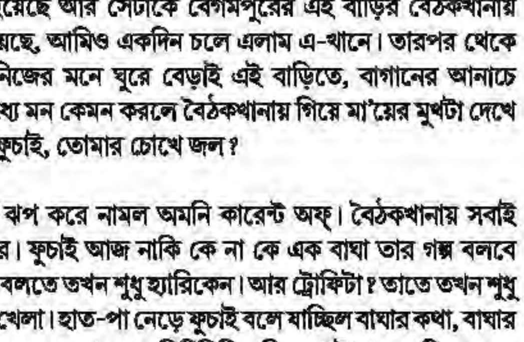

সমাধান হয়নি যে রহস্যের

সহেলী চট্টোপাধ্যায়

'আমি ব্ল্যাক ম্যাজিক জানি।' মৃদু মৃদু হাসছিল দোলা। ভীষণ বাজে বকে মেয়েটা। সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। দোলা আমার মামাতো বোন, খুব গল্পবাজ মেয়ে। কত যে বানিয়ে বানিয়ে বকতে পারে! ছোটোবেলায় আমি ওকে খুব শাসন করতাম কিন্তু একদম পাত্তাই দিত না আমায়।

এবার বেশ অনেকদিন পর মামাবাড়ি গেছি। দোলা যথারীতি গল্পের ঝাঁপি খুলে বসেছে। আমাকে মুখ খুলতেই দেয় না। এবার দোলার মাসতুতো ভাই শানু এসেছে। বেশ মজায় দিনগুলো কাটছে। বলতে ভুলে গেছি। আমার মামার বাড়ি নিউ জলপাইগুড়িতেতে। ওখান থেকে অনেক জায়গায় যাওয়া যায়। দারুণ সুন্দর ছবির মত পরিবেশ। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে হাঁটতে হাঁটতে আমরা করলা নদীর তীরে চলে যাই। কখনো জল্পেশ্বরের মন্দির, তো কখনো গরুমারা। মামার সঙ্গে জিপে করে গিয়েছিলাম চুয়াপাড়া চা বাগান। শানু আর আমি অনেক ছবি তুলেছি। সবুজের সমারোহ চারদিকে। হঠাৎ একটা বাংলো প্যাটার্নের পুরনো বাড়ির ওপর আমার নজর পড়ে যায়। বাড়িটা যে বানিয়েছে তার রুচির প্রশংসা না করে পারলাম না। কেউ থাকে বলে তো মনে হচ্ছে না। ইস। এত সুন্দর পরিবেশে এরকম বাড়ি করে ফেলে রাখার কোনো মানে হয় না।

'ওই দাদা কী করছিস ওখানে? চলে আয়।' দোলার ডাকে সম্বিৎ ফেরে আমার। বললাম, 'বাড়িটায় কেউ থাকে না কেন?

'ওটা একটা ভুতের বাড়ি। হন্টেড হাউস।'

'তোর কোন কথাটা যে বিশ্বাস করব আর কোনটা অবিশ্বাস করব বুঝতে পারি না।'

'দোলা কিন্তু ঠিকই বলছে। ওটা ভুতুরে বাড়ি, ওই বাড়িতে কেউ এক রাত্রিরও থাকতে পারবে না।' মামা বললেন।

শানু বলল, 'কিন্তু ভুত বলে তো কিছু নেই। সবটাই গুজব।'

মামা বললেন, 'আমিও তো তাই জানতাম। কিন্তু এই বাড়ি সত্যিই হানাবাড়ি। বেশ কয়েক বছর আগে পরিবারের সব সদস্যদের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়। তারপর অনেকবার হাত বদল হয় বাড়িটার। কিন্তু কেউই টিঁকতে পারে নি। দুর্নাম হয়ে যায় বাড়িটার। এখন কেউ বাস করে না।'

চা বাগান দেখে ফিরে এলাম কিন্তু বাড়িটার কথা মন থেকে মুছে ফেলতে পারলাম না। আমার এই রকম পুরনো বাড়ি খুব ভালো লাগে। দোলা চা আনল। ঠিক ওই সময়ই ও বললো, 'ব্ল্যাক ম্যাজিক জানি আমি।' দু'বার বলল কথাটা। শানু বলল, 'তাই যদি জানিস তো দুটো একটা নমুনা দে তো দেখি।'

দোলা বলল, 'আচ্ছা ঘরের আলো নিভে যাক।' সত্যি সত্যি দপ করে ঘরের আলো নিভে গেল। গোটা বাড়ি অন্ধকার। শানু তো 'থ', দোলা আবার বলল, 'আলো চলে আসুক।' সত্যি সত্যি আলো জ্বলে উঠল আবার। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। ঘরের বাইরে চলে এলাম। দোলার ছোট্টো বন্ধুর হাত ধরে টানতে টানতে ভেতরে এলাম। 'শানু এই ছেলেটিই দোলার ইশারা মতো মেন অন-অফ করেছে।'

মামার বাড়ির দারোয়ানের বারো বছরের ছেলে বীরবাহাদুর ছেত্রী। সেই দোলার যত অপকর্মের সঙ্গী। নিজে কলেজে পড়লেও ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের সঙ্গেই ওর বেশি বন্ধুত্ব। আমি বললাম, 'আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া শুধু শক্ত নয়, অসম্ভবও। দরজার দিকে মুখ করে বসেছিলাম, বীরের কাজকর্ম সব ধরা পড়ে গেছে।' দোলা একটুও অপ্রতিভ নয়। হেসেই যাচ্ছে। বীর একবার প্রতিবাদের চেষ্টা করল। তারপর হাত ছাড়িয়ে পালালো।

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম এক রাত যদি ভুতের বাড়িতে কাটানো যেত, বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হতো তাহলে। শানুকে দলে টানতে হবে।

সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে আমি ভুতের বাড়িতে রাত কাটানোর প্রসঙ্গ তুললাম। শানু আমার প্রস্তাবে রাজি। মামা বললেন, 'তোদের বারণ করলেও তোরা শুনবি না কিন্তু বীরের বাবা অমর তোদের সঙ্গে থাকবে। ওর খুব সাহস। একবার ডাকাতের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করেছিল।'

ভাগ্যিস মামিমা নেই। বন্ধুর মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে দু'দিনের জন্য শিলিগুড়ি গেছেন। না হলে আর দেখতে হতো না! ঠিক হল বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমরা ভুতের বাড়ি চলে যাবো। সারা রাত জাগতে হবে তাই দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। দোলা জিজ্ঞাসা করল ' কী কী নেব রে দাদা?'

'তোকে কে নিয়ে যাচ্ছে? তুই বাড়ি থাকবি।'

'না সে হবে না আমিও যাবো।' দোলার কথা শুনে ভয় পেলাম। ভীষণ জেদি মেয়ে। আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, ' না বোন তোর ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। কত রকম বিপদ হতে পারে।'

দুপুরবেলা দোলা ঘুমিয়ে পড়ার পর আমি আর শানু বেরিয়ে পড়লাম। দোলার ঘরের দরজায় বাইরে থেকে তালা আটকে দিয়েছি। বেচারি এখন নিজের ঘরেই বন্দী। চাবি আমার পকেটে। ওর ভালোর জন্যই করতে হল। ঐ অন্ধকার ভুতুরে বাড়িতে ওকে নিয়ে যেতে পারলাম না। মামার পরামর্শ নিয়েই ওকে তালাবন্ধ করেছি। অমর আগে থেকেই পৌঁছে গেছে। দু'টো ঘর বেশ পরিষ্কার করে ফেলেছে। আমরা এমার্জেন্সি, মোমবাতি, টর্চ, দেশলাই, মাদুর, তাকিয়া, সব নিয়ে এসেছি। কোনো এক সময় গিয়ে রাতের খাবার নিয়ে আসতে হবে। আজ ধাবার খাবার খাবো। ভুত-টুত সব গুজব আসলে অ্যাডভেঞ্চার আর মজার জন্যই এত সব। শানু ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে এল। আস্তে আস্তে সন্ধে নেমে এল। শানু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'যাহ্!'

'কী হল?'

'দোতলা-তিনতলাটা দেখা হল না।'

'সত্যি তো, কাল সকালে দেখা যাবে।'

আমরা যে ঘরটায় আস্তানা গেড়েছি সেটা বেশ বড়ো একটা ঘর। আসবাবপত্র কোথাও কিছু নেই। পুরনো কেমন একটা গন্ধ পাচ্ছি, বোধহয় চামচিকে বা বাদুর। দরজায় একটা ক্ষীণ শব্দ হতে একটু নড়ে চড়ে বসলাম।

(এরপর ৯ পাতায়)

রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম এক রাত যদি ভুতের বাড়িতে কাটানো যেত, বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চার হতো তাহলে। শানুকে দলে টানতে হবে। সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলে আমি ভুতের বাড়িতে রাত কাটানোর প্রসঙ্গ তুললাম। শানু আমার প্রস্তাবে রাজি।

অঙ্কন : তপন চক্রবর্তী

ধারাবাহিক উপন্যাস

বুমবুম আর উড়ে গেল রাজার মুকুট

বিবেক কুণ্ডু

(আগে যা ঘটেছে : গুহার মধ্যে বসে ঈগল রাজার মুকুট হাতিয়ে নিয়ে সবুজ পাহাড়ের রাজা হবার চক্রান্ত করে বনের এক দুষ্টু মহারাজা। তাকে কেউ দেখেনি, কিন্তু বনের কিছু দুষ্টু প্রাণিদের নিয়ে গোপন মিটিং করে থাকে মাঝে মাঝেই। সেই কথা জেনে সবুজ পাহাড়ের গুপ্তচর গিরগিটি খবর পৌঁছে দেয় বুড়ো মৌমাছির কাছে যে সেটাকে সঙ্কেত বানিয়ে সবুজ পাহাড়ে খবর দিতে পাঠায় ছোট্টো মৌমাছি পাজি'র মাধ্যমে। বুমবুম সাইকেল চালাতে গিয়ে মুশকিলে পড়ে, পরে ইচ্ছেভূত নামের এক দারুণ ইন্টারেস্টিং অদৃশ্য ভূত তাকে সাইকেল শেখায়। ইচ্ছেভূত বলে, বুমবুমের ইচ্ছে হলেই সে বুমবুমকে হেল্প করতে চলে আসবে। সাইকেল নিয়ে বুমবুম আর ডিংগো যায় ইকো পার্কে। সেখানে ছোট্টো মৌমাছি পাজিকে দেখে বুমবুম ট্যাব দিয়ে ভিডিও ছবি তুলতে শুরু করে। তারপর হঠাৎ বুমবুমের চোখে পড়ে যায় - এক মোটাসোটা গিরগিটি লম্বা জিভ বাড়িয়ে খেতে আসছে মৌমাছিকে। কীভাবে তাকে বাঁচানো যায়, সেটা ভাবতে থাকে বুমবুম।)

চোখের সামনে বসে আছে হলুদ কালো ডোরা দেওয়া সুন্দর একটা মৌমাছি যে একটু পরেই আর থাকবে না। মোটাসোটা ক্যামেলিয়ন গিরগিটিটা তার লম্বা আঠা মাখানো জিভ দিয়ে সুড়ুৎ করে মুখের মধ্যে টেনে নেবে তাকে। ব্যাপারটা চোখের সামনে দেখে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না বুমবুম। পাশের ফুলগাছ থেকে একটা ডাল ভেঙ্গে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল ক্যামেলিয়নটার দিকে। গায়ে মাথায় কাঁটা, বাদামি আর সবুজ মিলিয়ে অদ্ভুত দেখতে এই গিরগিটিটা আবার চোখটাকে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। বুমবুম ওকে সরাবার জন্য ডালটা একটু বাড়িয়ে ধরতেই ফোঁস করে উঠল একবার। সঙ্গে সঙ্গে বুমবুমের প্যান্টটা টেনে ধরল ডিংগো।

'কী হল, এমন করছিল কেন?' পেছন ঘুরে ডিংগোকে বলল বুমবুম।

'তোমার কি মাথা খারাপ?'- বেশ উত্তেজিত হয়ে বলল ডিংগো - 'এটা ক্যামেলিয়ন গিরগিটি। এমনিতে খুব শান্ত কিন্তু রেগে গেল জোরসে অ্যাটাক করে। ওকে এভাবে আটকাতে যাওয়া রিস্কি। ওর দুটো চোখ আলাদা আলাদা করে ও চারদিকে ঘোরাতে পারে। এক চোখ দিয়ে মৌমাছিকে দেখবে আর এক চোখ দিয়ে তোমাকে। ও গায়ের রংও খুব তাড়াতাড়ি বদলাতে পারে, দেখছো না কেমন সুন্দর গাছের ডালটার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। মৌমাছিটা ওকে দেখতেই পাচ্ছে না। মনে করে দেখ, সেদিনকেই তো আমরা ক্যামেলিয়নের একটা ভিডিও দেখলাম।'

মনে পড়ে গেছে বুমবুমের। সেই ভিডিওটায় ক্যামেলিয়নটা আবার একটা সাপের সঙ্গে লড়াই করছিল। সত্যিই, ওকে এভাবে আটকাতে যাওয়াটা বোকামি। এসব ভাবতে ভাবতেই বুমবুম দেখল ক্যামেলিয়নটা একটা ডালের মধ্যে নিজের লেজটাকে বেশ করে পেঁচিয়ে ফেলল। তারপর একটু ঝুলে পড়ে শিকার ধরবার মতো ভালোভাবে মৌমাছিকে নজর করেই সট্ করে ছুঁড়ে দিল ওর লম্বা জিভটা। চোখের নিমেষে জিভের ডগাটা একলাফে গিয়ে আটকে গেল মৌমাছির ডানায়।

দেখামাত্র শিউড়ে উঠে এক মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে ফেলল বুমবুম আর ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা শব্দ - 'ইচ্ছেভূত'।

বুমবুম কথাটা বলতেই পরপর বেশ কয়েকটা কাণ্ড হল।

একটা দমকা হাওয়া এসে বেশ খানিকটা ধুলো উড়িয়ে দিল চারপাশে। চোখ ঢাকতে হাতদুটো মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে নিল বুমবুম।

ক্যামেলিয়নটা মৌমাছি সমেত জিভটা মুখের দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করতে গিয়ে আটকে গেল। মনে হল অদৃশ্য কেউ ওকে চেপে ধরেছে। বুমবুম দেখতে পেল, কে যেন ওর জিভের আঠা থেকে আস্তে করে মৌমাছির ডানা ছাড়িয়ে জিভটাকে উল্টোদিকে বেঁকিয়ে দিল। তারপর ওর জিভটাকে ধরে ওর শরীরটা লাট্টুর মত বেশ কিছুক্ষণ ঘোরানোর পর আস্তে করে ওকে মাটিতে ফেলে দিতেই একছুটে পগার পার হয়ে গেল ক্যামেলিয়নটা।

পেছন থেকে কেউ একটা বলে উঠল, 'এসে গেছি বুমবুম।'

বুমবুম বুঝে গেল, ইচ্ছেভূত হাজির। বুঝে গেল ডিংগোও।

'থ্যাঙ্ক ইউ ইচ্ছেভূত'। - মিষ্টি করে হেসে বলল বুমবুম। 'তুমি না থাকলে আজ মৌমাছিটাকে বাঁচান মুশকিল হত।'

'আরে না না, তোমার মনটা এত সুন্দর বলেই তো আমি এলাম। দুষ্টু লোকের ইচ্ছে হলেও আমি আসি না। উলটে দুষ্টুমি করি তারই সঙ্গে। তবে ওকে আমি বাঁচিয়ে দিলেও পরের কাজটা তোমাকেই করতে হবে।' - একটু হেসে বলল ইচ্ছেভূত।

'পরের কাজ?' - অবাক হয়ে জানতে চাইল বুমবুম।

বিজ্ঞের মত জবাব দিল ইচ্ছেভূত, 'দেখছ না, ওর ডানার ওই ক্যামেলিয়নটার জিভের আঠা বেশ খানিকটা লেগে গেছে। তাই ও ঠিকমত ডানা নাড়াতে পারছে না। ওটা পরিষ্কার করে দেওয়া দরকার। নইলে ও উড়বে কেমন করে?'

ওহ তাই তো। বুমবুম ওর পিঠের ব্যাকপ্যাক থেকে জলের বোতলটা বের করল। তারপর পকেট থেকে বের করল ওর রুমালটা। ওটা জলে একটু ভিজিয়ে এগিয়ে গেল মৌমাছির দিকে।

এদিকে ছোট্টো মৌমাছি পাজি পড়েছে বেজায় মুশকিলে। মধু খেতে খেতে জিরিয়ে নেবার জন্য একটা ফুলের ওপর বসতে গিয়ে আরেকটু হলেই ওই মোটা গিরগিটিটার পেটে

(এরপর ৯ পাতায়)

বুমবুম আর ঈগল রাজার মুকুট

(৮ পাতার পর)

যেতে বসেছিল। গিরগিটির আঠালো জিভটা ওর ডানায় লাগতেই ওর মনে হয়েছিল, এই বুঝি গেল, সবুজপাহাড়ে সংকেত নিয়ে যাওয়া হল না আর। ওই মিষ্টি ছেলেটাই মনে হয় ওকে বাঁচিয়ে দিল। কিন্তু ওই গিরগিটির জিভের আঠা বাজে ভাবে গেলে গেছে একটা ডানায়। সেটাকে নাড়াতেই পারছে না পাজি। এদিকে ওই ছেলেটাও আবার এদিকেই এগিয়ে আসছে। কী করতে চাইছে ও?

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, কর কী?' - ইচ্ছেভূতের গলার আওয়াজ পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বুমবুম। আর কিছু বলতে যাবার আগেই হল আরেক মজার কাণ্ড।

ওর হাতের বোতলটা নিজে থেকেই হাত ফস্কে শূন্যে ভাসতে শুরু করে দিল। আস্তে আস্তে ভেসে ভেসে ঠিক মৌমাছি যেখানটায় ফুলের ওপরে বসে আছে, সেখানে গিয়ে থেমে গেল বোতলটা। তারপর আস্তে আস্তে বোতলের ছিপিটা খুলে গিয়ে ভাসতে লাগল পাশে। বোতল কাত হয়ে গেল, কিন্তু মজার ব্যাপার এতটুকু জল গড়াল না। জলের লেভেলটা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল, নড়ল না একটুও।

'হাঃ হাঃ হাঃ, নিউটন সাহেব থাকলে আজ আমাকে নিশ্চিত পুরস্কার দিতেন। মাধ্যাকর্ষণকে নিয়ে খেলাটা কেমন লাগছে বুমবুম? কাত হওয়া বোতল থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে না, কিন্তু ল অফ গ্র্যাভিটি তো উল্টোটাই বলে। আসলে এখানে আসছে একখানা অ্যান্টি গ্র্যাভিটি ফ্যাক্টর, আর সেটা হল আমার ইচ্ছে বা উইল পাওয়ার। আমি ইচ্ছে দিয়ে জলটাকে আটকে রেখেছি। অনেক কিছুই এমন আটকে রাখতে পারি আমি।' বেশ গমগমে স্বরে বুমবুমের কানের কাছে কথাটা বলল ইচ্ছেভূত।

বুমবুম সত্যি অবাক। ইচ্ছেভূত শুধু ইচ্ছে দিয়ে আজব আজব কাণ্ড ঘটাতে পারে। ইচ্ছের জোর অনেক।

'রুমাল দিয়ে ডানা মুছতে গেলে ওর ব্যথা লাগবে যে। এবার দেখ বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়বে। তুমি শুধু আস্তে করে ফুঁ দিয়ে দাও। তাহলেই কাজ হবে। একটা করে ফোঁটার জন্য একটা করে ফুঁ।' ইচ্ছেভূতের কথা শুনে আবার বোতলের দিকে তাকাল বুমবুম।

বুমবুমকে অবাক করে দিয়ে বোতল থেকে বেরিয়ে এল জলের একটা ফোঁটা। বুমবুম আবার দিল ফুঁ।

সুন্দর জলের মিহি ফোয়ারায় ডানার আঠা আঠা ভাবটা কেটে যেতেই একটু একটু করে ডানা নাড়াতে পারল ছোট্টো মৌমাছি পাজি। ব্যাস, আর দাঁড়াল না সে। ফুড়ুৎ করে উড়ে রওনা দিয়ে দিল সবুজ পাহাড়ের দিকে। এমনিতেই ওর বেশ খানিকটা দেরি হয়ে গেছে।

নিচে দাঁড়িয়ে উড়ন্ত মৌমাছির দিকে চেয়ে রইল বুমবুম আর ডিংগো। অদৃশ্য ইচ্ছেভূত পেছনে দাঁড়িয়ে দিতে লাগল হাততালি। তখন ওরা কেউই জানে না যে মৌমাছির সঙ্গে ওদের আবার দেখা হবে।

।।৫।।

লাল পাহাড়ের মাঝখানে সবুজ গাছে ভরা ঈগল রাজার বিশাল দেশ সবুজ পাহাড়। দেশের চারদিকে চারখানা বিশাল বিশাল দুয়ার। সেখানে দারুণ পাহারা, ফাঁকি দিয়ে ঢুকতে গেলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা পুরোমাত্রায়। অন্ধকারেও হালকা হলুদ আলোর আভায় ভরে আছে চারদিক। দক্ষিণ দুয়ার ধরে বেশ খানিকটা এগোলেই এক কোণে দেখা যাবে একটা ছোট্ট কালো পতাকা। পতাকাটা দেখে বোঝবার উপায় নেই যে ওর ঠিক নিচেই বেশ বড়োসড়ো একখানা সুড়ঙ্গ লুকিয়ে রয়েছে। সুড়ঙ্গ ধরে বেশ কিছুটা এগোলে চোখে পড়বে একখানা গোল দরজা। আর সেই দরজার পেছনেই রয়েছে সবুজপাহাড়ের সঙ্কেত ঘর যেখানে এই মুহূর্তে বসে আছে এক প্রহরী ঈগল। ওর নাম মাচুপিচু। সামনের স্ক্রিনে ও দেখতে পাচ্ছে বাইরে এবং সুড়ঙ্গের ভেতরে কী কী হচ্ছে। এই সঙ্কেত ঘরের ডিউটি বড় ঝক্কির কাজ। সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, কারা আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছে সে ব্যাপারেও রাখতে হয় কড়া নজর। কিছু বিশেষ লোকজন ছাড়া এখানে সবার আসার বারণ। চারদিকে ক্যামেরাও বসান আছে অনেক। যেমন একখানা বসান আছে পতাকার খুঁটির ঠিক ডগায়।

ছোট্টো মৌমাছি পাজি যখন কালো পতাকার ওপর এসে বসল তখন সন্ধে নেমে গেছে। ও ছোট্টো বলে কেউ ওকে নজর করেনি। চারপাশ অন্ধকার, কিন্তু পতাকার খুঁটির ডগায় বসান অন্ধকারের ক্যামেরাটা অন হয়ে গেল। অনেকটা উড়ে এসে পাজির গা তখন বেশ গরম, তাই ক্যামেরায় ওর বেশ ভালো ছবি উঠে পৌঁছে গেল সঙ্কেত ঘরে। (গায়ের তাপ বেশি থাকলে এই অন্ধকারের ক্যামেরাটায় বেশি ভালো ছবি ওঠে) স্ক্রিনটায় আওয়াজ শুরু হল - জিগ্ জ্যাগ্ জিগ্।

নড়েচড়ে বসল মাচুপিচু। এটা তো চেনা কারুর আসবার সঙ্কেত শব্দ। অন্ধকারের ক্যামেরা নিশ্চয়ই অন হয়ে গেছে। গোল স্ক্রিনটায় ভেসে ওঠা ছবিটা চটপট দেখে নিল সে। তারপর টিপে দিল একখানা বড়ো সুইচ।

পতাকার উপরে বসে পাজি দেখতে পেল, ওর নিচে একখানা পাটাতনের মতো দরজা খুলে গেল আস্তে আস্তে। ভেতর থেকে আস্তে করে শোনা গেল কয়েকটা শব্দ - ভিন্‌ভিন্ পিংপিং চিন্ চিন্ কাই। শব্দগুলোকে জুড়ে মনে মনে গুনগুন করতেই পাজি বুঝে গেল ওকে ভেতরে ঢুকতে বলা হয়েছে।

আর দেরি না কর সোজা সুড়ঙ্গে নেমে পড়ল পাজি। পাটাতন পরে গিয়ে সুড়ঙ্গ পথ বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

সমাধান হয়নি যে রহস্যের

(৭ পাতার পর)

জিজ্ঞাসা করলাম 'কে?' নাহ্! কোনো সাড়া নেই। শানু কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছে তাই বোধহয় শুনতে পায়নি।

কোথায় কিছু নেই তবু মনে হচ্ছে কিছু যেন আছে। মনে হয় বিড়াল বা ইঁদুর। মানুষ কত সহজেই ভয় পেয়ে যায়। এবার আমার ঠিক পেছনে ধপাস করে শব্দ হল। আমি চমকে উঠে পড়লাম। 'কাজ নেই দাদা এখানে রাত কাটিয়ে, চলো দাদা ফিরে যাই।' শানু বলল।

'এত সহজে ভয় পেলি। দাদা।' চমকে গেলাম প্রত্যেকেই – কে বলল? শানুর হাত থেকে মোবাইল খসে পড়ল। অমরের চোখও গোল গোল। আবছা আলো আর অন্ধকারের ভেতর থেকে এগিয়ে এল দোলা। লাল রঙের চুড়িদার পড়া দোলা হাতে একটা বিগশপার। মুখে সেই চিরপরিচিত হাসি। যা দেখে আমার পিত্তি চটে যায়। 'তুই! তোকে তো বন্ধ করে এসেছিলাম। চাবিও আমার পকেটে।'

'আমি ব্ল্যাক ম্যাজিক জানি। চাবি তালা দিয়ে আমাকে আটকাতে পারবে না দাদা।'

শানু বলল, 'ও তুই তাহলে তখন থেকে শব্দ করছিস?'

'তোদের কখন থেকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছি! কিন্তু তোরা ভয় পেলে তো।' ও হতাশা দেখায় মুখে।

'তুই ব্ল্যাক ম্যাজিক জানিস। আর কত গুল দিবি দোলা। যথেষ্ট বড়ো হয়েছিস।' আমি বললাম।

শানু বলল। 'তুই এসে বিপদে ফেললি।'

'মেয়েদের বড্ড নিচু নজরে দেখিস তোরা। এই জন্যই দেশের কিছু হয় না। ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন এনেছি দোকান থেকে। আর কষ্ট করে বেরুতে হবে না।' হাতের বড়ো ব্যাগ থেকে একটা টিফিন ক্যারিয়ার বার করে দোলা।

আর বলতে হবে না। আমরা সবাই হাত-টাত ধুয়ে বসে পড়লাম। দোলা আমাদের পরিবেশন করে নিজেও নিল। বললাম, 'এই বাড়ির লোকেদের কী হয়েছিল রে?'

'বাজ পড়েছিল। আমি ঠিক জানি না। ভয় লাগে দাদা। এসব জিজ্ঞাসা করিস না।' শানু বলল, 'রাতটা বেকার কাটলো। ভূতের দেখা নেই।' আমি বললাম, কিন্তু পেত্নির দেখা পাওয়া গেছে।' দোলা আমার দিকে তাকাল কিন্তু কিছু বলল না। শানু বলল, 'কোল্ড ড্রিঙ্ক আনি একটু।'

দোলা বলল, 'অমরদাকে নিয়ে যা।'

আমি টাকা দিলাম। শানু অমরদাকে নিয়ে চলে গেল, আমি আর দোলা বসে আছি। কানের কাছে গুনগুন করে দোলা একটা সুর ভাঁজছে। চোখ বুজে তাই শুনছি। দোলার গান এক সময় থেমে গেল। বললাম, 'থামলি কেন? বেশ তো গাইছিলিস?'

দোলা কোনো উত্তর দিল না। আমার চোখে ঘুম নেমে এসেছে। চোখ বুজেই ছিলাম। শানুর ডাকে তন্দ্রাটা কেটে যায়। কোল্ড ড্রিঙ্কের টিন হাতে ধরিয়ে দেয় ও। বলল। 'দোলা কই?' আশ্চর্য তো। অন্ধকারে ও এমনিতেই ভয় পায়। কোথায় গিয়ে লুকালো? ওর নাম ধরে অনেক ডাকলাম কিন্তু কোনো সাড়া নেই। গাড়ি নিয়ে সোজা মামার বাড়ি চলে এলাম। মামা ড্রয়িং রুমে টিভি দেখছেন। আমাদের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হয়েছে রে? তোদের এমন উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন?'

'দোলাকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'দোলা কি তোদের সঙ্গে গেছিল নাকি? ও তো ওপরের ঘরে। বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে গেছিস মনে নেই?'

'তুমি চাবি খুলে দাওনি তো?'

'চাবি তো তোর সাথেই ছিল। গিয়ে দ্যাখ না।'

দৌড়ে দোতলায় উঠলাম, ঘরে তালা দেওয়া। চাবি খুলে দেখি দোলা বিছানায় অঘোরে ঘুমোচ্ছে। দোলার ঘরে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম, বারান্দা সবই আছে। তাই তালা দেওয়াতে ওর কোনো অসুবিধা হয়নি।

মামা নানাভাবে জেরা করে নিশ্চিন্ত হলেন আমরা পেত্নিই দেখেছি। সত্যি দোলাকে যখন পাওয়া যাচ্ছিল না আমাদের এঁটো থালাবাসন, টিফিন ক্যারিয়ারের কোনো চিহ্ন ছিল না। তাহলে কি সবটাই আমাদের ভ্রম। আমার ভূত-পেত্নিতে বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। দোলার মত সেই রাতে কাকে দেখেছিলাম? মামা আর দোলার কোনো কারসাজি ছিল না এর পেছনে, আমি হলফ্ করে বলতে পারি। কারণ মামা খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। তবে কি দোলা সত্যিই ব্ল্যাক ম্যাজিক জানে? যার ফলে সে বন্ধ দরজা অতিক্রম করে আমাদের কাছে পৌঁছেছিল। তোমাদের কী মনে হয়? তোমরা নিজেদের মত করে ভেবে নিতে পারো।

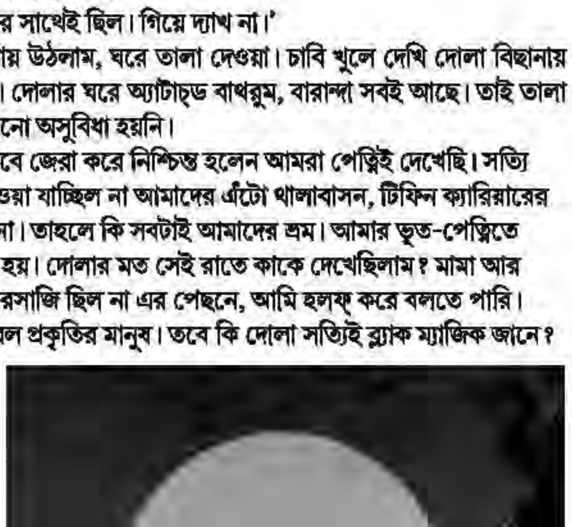

ক্যাপচা (CAPTCHA) কী?

যারা তোমরা কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট ব্যবহার কর তারা কম বেশি এই শব্দটির সঙ্গে সবাই পরিচিত। পুরো কথাটি হল 'কমপ্লিটলি অটোমেটেড পাবলিক টিউরিং টেস্ট টু টেল কম্পিউটারস অ্যান্ড হিউম্যানস অ্যাপার্ট'। এটি এক বিশেষ রকমের পদ্ধতি যার উদ্দেশ্য মানুষ এবং কোনো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, রোবট নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং অথবা সফটওয়্যারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা।

কীভাবে একটি কাজ করে?

ক্যাপচা কম্পিউটার বিশেষ করে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের কাছে ছোট্টো পরীক্ষার মতো। কম্পিউটারের পর্দায় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় লেখা আঁকাবাঁকা অথবা আধো-ঝাপসা অক্ষরচিহ্ন সংখ্যাযুক্ত সংকেত সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার ব্যবহারকারীকে নির্দিষ্ট জায়গায় ঠিকঠিকভাবে বসাতে হয়। তবেই ওই নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে। সংকেতে কোনো ভুল হলে নতুন ক্যাপচা কম্পিউটারের পর্দায় ফুটে উঠবে। একই গন্তব্যে পৌঁছাতে আলাদা ব্যবহারকারীরা আলাদা আলাদা ক্যাপচা পাবে। ফলে নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিং বা কম্পিউটারের পক্ষে ক্যাপচা বসানোর শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব নয়। এটা একমাত্র মানুষই করতে পারে।

কোথায় ব্যবহার?

নেট ব্যাঙ্কিং, অনলাইন শপিং, অনলাইনে বিমান-রেলের টিকিট বুকিং, নির্দিষ্ট পাসওয়ার্ড বারবার ভুল হলে ক্যাপচা 'কোড' বসাতে হয়। অনেক সময় ই-মেল পাঠানোর সময় ক্যাপচা কোড বাধ্যতামূলক। এই ক্যাপচা কোড যেহেতু প্রোগ্রামিং বা সফটওয়্যারের সাহায্যে 'কপি' করা সম্ভব হয় না, তাই ওয়েবসাইট 'হ্যাকিং' রুখতে এটি অদ্বিতীয়।

শামুকের খোলাতেই সমাধান!

সামুদ্রিক প্রাণিদের মধ্যে নানারকম রঙয়ের ও নকশার খোলসযুক্ত শামুকের প্রতি আমাদের অনেকেরই আকর্ষণ আছে। সমুদ্রের জলে বিভিন্ন রাসায়নিক বর্জ পদার্থের দূষণের ফলে অবশ্য বিভিন্ন প্রজাতির শামুকের অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে। এগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আশ্চর্য বর্ণময় খোলসের 'স্কেলি-ফুট স্নেইল' নামের একধরণের শামুক।

তোমরা সবাই জানো, শামুক হচ্ছে কম্বুজ বা মোলাস্কা জাতীয় প্রাণি - অনেকটা ঝিনুক, অক্টোপাস আর স্কুইডের গোত্রভুক্ত। এই 'স্কেলি ফুট স্নেইল'-এর খোলা বা 'এক্সোস্কেলিটন'টি যথেষ্ট মজবুত। প্রশান্ত মহাসাগরের ২,৪০০ মিটার গভীরে বাস করে এই শামুকটি। অনায়াসে এই বিপুল পরিমাণ জলের চাপ সহ্য করতে পারে এরা। এছাড়া সামুদ্রিক জলপ্রবাহের অম্লতা এবং সমুদ্রের তলায়, পাথরের ফাটল থেকে বেরিয়ে আসা গন্ধক বা সালফার মেশানো গরম জলও ক্ষতি করতে পারে না এই মজবুত খোলসের সমুদ্র শামুকের।

স্কেলি ফুট শামুকের খোলসটার তিনটি স্তর। প্রথম স্তরটি তৈরি আয়রন সালফাইড যৌগের সাহায্যে। দ্বিতীয় স্তরটি প্রোটিনের। তৃতীয় স্তরটি গড়ে উঠেছে একটি ক্যালসিয়াম জাতীয় খনিজ 'আরাগোনাইট' দিয়ে। এত শক্ত খোলস থাকার জন্য শিকারি কাঁকড়ার মোটা, ধারালো দাঁড়া মোটেই স্কেলি ফুট শামুককে ঘায়েল করতে পারে না। দিনের পর দিন দাঁড়া দিয়ে স্কেলি ফুট শামুকের খোলস কামড়ে রেখেছে কাঁকড়া, তবুও সেই খোলসে একটুও চিড় ধরেনি।

স্কেলি ফুট শামুকের দুর্ভেদ্য খোলাটিকে ভেঙে পরীক্ষা করার জন্য 'ইনডেন্টার' নামে একধরণের হীরের টুকরো যুক্ত যন্ত্রের সাহায্য নিতে হয় প্রাণিবিজ্ঞানীদের। সেই যন্ত্রের সাহায্যে শামুকটির খোলার বিভিন্ন স্তরের গঠন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তাঁরা। শামুকটির খোলার প্রথম স্তরে আয়রন সালফাইডের কণাগুলি খোলাটিকে বেশি আকারে ফাটতে দেয় না। মাঝখানের স্তরটিরও ক্ষমতা আছে বাইরের কোনো প্রাণির বা কঠিন বস্তুর আঘাত সহ্য করার।

স্কেলি ফুট শামুকের এই অভিনব দুর্গের মতোই সুরক্ষিত খোলসের কারিগরী গঠন নিয়ে গবেষণা করছেন অনেক বিজ্ঞানী। তাঁদের মতে, এই শামুকের খোলসের গঠনকে নকল করে মোটরবাইক আরোহীদের সুরক্ষার জন্য আরো শক্তপোক্ত হেলমেট বানানো যাবে। বুলেটের আঘাত প্রতিরোধ করতে পারা জামা বা বর্মও বানানো সম্ভব হতে পারে। এমনকী, এই খোলস-প্রযুক্তিকে অনুসরণ করে জাহাজ বা বিমানের গঠনকে আরো মজবুত করার কথাও বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। উত্তর মেরুর প্রচণ্ড ঠাণ্ডাতে, অশোধিত খনিজ তেল বয়ে নিয়ে যাওয়ার পাইপের মধ্যে বরফ জমে পাইপ অনেক সময়ই ফেটে যায়। এই শামুকের খোলসের মতো শক্ত তৈলবাহী পাইপ বানানো যায় কিনা সেটাও খতিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

শুরু হয়েছে ক্যুইজ। অসংখ্য পাঠক-পাঠিকা এবং কচিকাঁচাদের অনুরোধে আমাদের এই বিভাগ **মগজাস্ত্র**। তোমাদের জন্য কলম ধরেছেন **ড. মৌসম মজুমদার**।

১। বাংলা সাহিত্যে ভূতের গল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে সত্যজিৎ রায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রায় প্রত্যেকেই ভূতের গল্প লিখেছেন। আমার প্রশ্ন 'মানুষের গন্ধ যাদের', 'যাদের নামে সবাই ভয় পায়', 'সন্ধ্যার পর সাবধান' - এই গল্পগুলির লেখক কে?

২। অমিতাভ বচ্চন তাঁর অভিনয় জীবনে সব ধরণের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। কিন্তু কোন সিনেমায় তিনি ভূতের চরিত্রে অভিনয় করেছেন? যেখানে শাহরুখ খান আর জুহি চাওলাও অভিনয় করেছেন। সিনেমাটির পরিচালক ছিলেন বিবেক শর্মা।

৩। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' সিনেমাটি উল্লেখযোগ্য। এই চলচ্চিত্রে দুই বন্ধু গুপি আর বাঘাকে ভূতের রাজা বর দিয়ে জীবন পাল্টে দিয়েছিলেন। এখন প্রশ্ন হল এই সিনেমাটিতে ভূতের রাজার কণ্ঠস্বরটি কার?

৪। ২০০২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত একটি ভৌতিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছিলেন গায়ক সোনু নিগম। এছাড়াও সিনেমাটিতে ছিলেন সানি দেওল, অক্ষয় কুমার, সুনীল শেট্টি, আদিত্য পাঞ্চোলি, হর্ষদ কাপুর, আরমান কোহলি, মনীষা কৈরালা প্রমুখ। রাজকুমার কোহলি পরিচালিত কোন চলচ্চিত্রের কথা আমি বলছি?

৫। অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি ভৌতিক গল্প 'মণিহারা' ও 'কঙ্কাল'-এর রচয়িতা কে?

৬। বেতাল নামক ভূত কে নিয়েই রাজা বিক্রমাদিত্যের কাহিনি বেতাল পঞ্চবিংশতি। রাজা বিক্রমাদিত্য কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?

৭। বিভিন্ন ভূতের মধ্যে স্কন্ধকাটা ভূত কাদের বলা হয়?

৮। সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত 'ভূতের ভবিষ্যত' চলচ্চিত্রের পরিচালকের নাম কি?

৯। সঙ্গীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা হেমন্ত কুমার কোন ভৌতিক চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন?

১০। ২০০০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দি চলচ্চিত্র 'রাজ' সারা ভারতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ডিনো মারিয়া, বিপাশা বসু অভিনীত, বিক্রম ভাট পরিচালিত এই চলচ্চিত্রটি কোন ইংরেজি চলচ্চিত্রের অনুকরণে তৈরি?

মিলিয়ে নাও

১। হেমেন্দ্রকুমার রায়।
২। চলচ্চিত্রটির কাহিনি অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'দ্যা ক্যান্তারভিল্লে ঘোস্ট' নামক কাহিনিকে ভিত্তি করে ২০০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ভূতনাথ' চলচিত্রে।
৩। সত্যজিৎ রায়।
৪। জানি দুশমন-এক অনোখি কাহানি।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৬। উজ্জয়িনী।
৭। যে সকল ভূতের মাথা নেই তাদের স্কন্ধকাটা বলে।
৮। অনীক দত্ত।
৯। 'বিশ সাল বাদ' (১৯৬২)।
১০। হোয়াট লাইজ বিনিথ।

মানুষ হতে হবে

মুখস্থ নয় চাই 'আমিও পারি' মানসিকতা

স্বামী শশিশেখরানন্দ মহারাজ

লেখক বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক

গত সংখ্যায় পরীক্ষার হলে কী কী করা উচিত তা তোমাদের বলেছিলাম। এইবারে বিষয় ধরে ধরে কিছু কথা বলবো। প্রথমেই অঙ্ক। সাধারণভাবে দেখা গিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের অঙ্কে একটা ভীতি থাকেই। নিউটনকে ছোটোবেলায় জড়বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অঙ্কে নির্বোধ বলেছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পরে সেই নিউটনই অঙ্কে ও পদার্থ বিজ্ঞানে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। অতএব তোমরা অঙ্কে ভয় পেয়ো না। এসো পরীক্ষা হলে অঙ্কের পরীক্ষায় ঠিক কী রকম মানসিকতা নিয়ে উপস্থিত হবে সেটা আলোচনা করি।

পরীক্ষা হলে, বিশেষ করে অঙ্ক পরীক্ষার দিন শ্রেণিকক্ষে ঢুকবে এই মন নিয়ে যে, 'আমিও পারি'। 'পারিব না একথাটি বলিয়ো না আর - কেন পারিবে না তাহা ভাবো শতবার।' অঙ্কের প্রতিটি অধ্যায়কে যদি সঠিকভাবে বুঝে থাক, তবে অঙ্ক পারবে। আর যদি প্রথম থেকেই অঙ্ক না বুঝে অন্য বিষয়ের মতো মুখস্থ করার

চেষ্টা করো তবে নিচের শ্রেণিতে ১০০ পেলেও, যত উপরে উঠবে অঙ্ক তত দুঃসহ হয়ে উঠবে। সুতরাং - আমিও পারি - এই মনোভাব তখনই আসবে যখন অঙ্কের ভাষা পড়ে অঙ্কটিতে কোন্ কোন্ নিয়মের সমাবেশ ঘটছে তা বুঝতে পারবে। তাই জানা অঙ্ক পড়লে সোজা মনে হয়, আর অজানা অঙ্ক পড়লেই কঠিন মনে হয়। কিন্তু কোনো অঙ্ক কঠিন তখনই হয়, যখন তোমার বুদ্ধি প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত অঙ্কটিকে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারছে না। সুতরাং অঙ্ক প্রশ্ন পেয়ে কমন্ পেলে ঠিক আছে, না হলে যে প্রশ্ন পারছ না তাকে বারবার পড়ো - দাঁড়ি, কমা মেনে। দেখবে বুঝতে পারছ। মনে রাখবে, অন্য সব বিষয়ে কিছুটা মুখস্থের স্থান থাকলেও অঙ্কে মুখস্থের স্থান খুবই অল্প। যেদিন থেকে তুমি অঙ্ক মুখস্থ করা শুরু করবে, সেদিন থেকেই একইসঙ্গে তুমি অঙ্ক নিয়ে বিপদেরও বীজ বপন করতে শুরু করবে। আবার অঙ্কের কিছু সূত্র থাকে, সেগুলো কিন্তু মুখস্থ করতেই হবে। সব সময়ে অঙ্ক বইয়ের হবে, জানা হবে এমন হতে পারে না। তাই কখনো কখনো প্রশ্ন কঠিন মনে হয়। আর সব অঙ্ক করা থাকবে এমন নাও হতে পারে। পরীক্ষার হলে বসে, ভেবে অঙ্কের উত্তর করতে হতে পারে। অঙ্ক বুদ্ধির বিষয়, অঙ্ক যুক্তি বিন্যাসের বিষয়, অঙ্ক হিসাবের বিষয়, অঙ্ক বোধের বিষয়। কত অঙ্ক তুমি মুখস্থ করবে? ভেবে দেখো। ভয় পেয়ো না। চোখ, কান, মন, খোলা রেখে এগিয়ে চল, বলছি 'তুমিও পারবে'। - আর তুমি বল 'আমিও পারি'।

(আগামীতে সমাপ্য)

আতঙ্ক নয়, অঙ্ক

গান শুনলে অঙ্কে মন বসে

এবারের লেখা একটা মজার গল্প দিয়ে শুরু করবো। অবশ্য গল্প হলেও ঘটনাটি সত্যি। যাকে নিয়ে এই কাহিনি তাঁর নাম কার্ল ফ্রেডরিক গাস (Karl Friedrich Gauss)। কার্লকে পৃথিবীর অন্যতম সেরা গণিতবিদদের মধ্যে অন্যতম বলে মানা হয়। তাঁর গণিতের মেধা খুব ছোটোবেলা থেকেই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু মজার কথা কার্ল স্কুলে যেতে শুরু করেছিল ৭ বছর বয়সে। স্বাভাবিক কারণেই তার আগে পর্যন্ত বিষয়টি সকলের অজানাই ছিল। এমনকী স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরেও কার্লের গণিতের মেধা কারো নজরে আসে নি। একদিন ক্লাসে শিক্ষক সবাইকে ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সমস্ত সংখ্যাকে পরপর যোগ করতে বললেন। শিক্ষক ভেবেছিলেন এই কাজটি দিয়ে তিনি অন্য ক্লাসের কিছু খাতা সেই সুযোগে দেখে নেবেন। অঙ্কের প্রশ্নটি ছিল এরকম : ১ + ২ + ৩ + ৪...... + ৯৯ + ১০০ = ?

কয়েক মুহূর্ত পরে সবাই যখন অঙ্কটি কষতে ব্যস্ত কার্ল তখন শিক্ষকের ডেস্কে খাতায় উত্তর লিখে নিয়ে চলে গিয়েছে। শিক্ষক তো যারপরনাই অবাক। অবাক হওয়ারই কথা। তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছ কার্ল আগে থেকে অঙ্কটি এবং তার উত্তর জানতো। কিন্তু মোটেই তা নয়। সমাধান করার জন্য সবাই যে পদ্ধতি অর্থাৎ পরপর সংখ্যাগুলি লিখে যোগ করতে শুরু করেছিল কার্ল সে পথে হাঁটে নি। সে খাতায় শুধু শুরুর দিকের একটি এবং শেষের দিকের একটি সংখ্যা যোগ করেছে। এরকম পরপর কয়েকবার করে দেখেছে প্রতিবারই যোগফল একই আসছে। ব্যাপারটা এরকম: ১ + ১০০ = ১০১, ২ + ৯৯ = ১০১, ৩ + ৯৮ = ১০১, ...

তারপরে সে হিসেব করেছে এরকম ক'টি ১০১ আসতে পারে। সেটা তোমরা মুখে মুখেই হিসেব করতে পারবে। এরকম ১০১ আসবে ৫০টি। তাহলে এবার কাজ হচ্ছে ১০১ কে ৫০ দিয়ে গুণ করা। এটাও খুবই সোজা। উত্তর হচ্ছে ৫০৫০। বুঝতেই পারছো কার্ল সবার বহু আগে সঠিক উত্তর বার করে ফেলেছে। কার্ল না জেনে যে পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছে সেটি অঙ্কের ভাষায় 'অ্যালগরিদম' হিসেবে পরিচিত। এটা ঠিক কার্ল সেই পদ্ধতি প্রথম ব্যবহার করে নি, কিন্তু কার্লের বয়সে সেই পদ্ধতি ব্যবহার অবশ্যই অচিন্তনীয়।

পরবর্তী কালে কার্ল জ্যামিতির জগতে অনেক নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন। অ্যাস্ট্রোনমিতেও কার্লের অবদান রয়েছে।

যাই হোক কার্লের গল্প তো শুনলে। এবার অন্য কিছু কথায় আসা যাক।

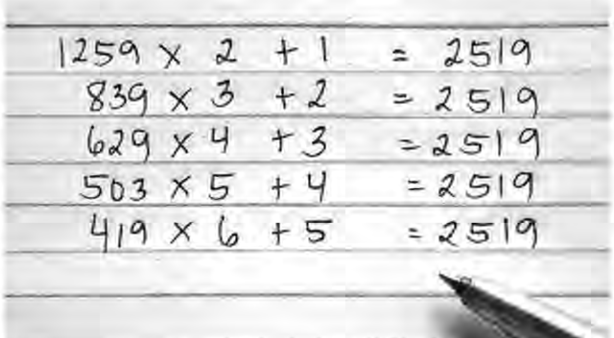

অঙ্ক আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি বিষয়ের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে। অঙ্ক ছাড়া আমরা একটু পথ চলার কথা ভাবতেই পারি না। কিন্তু এই অঙ্ক নিয়েই রয়েছে অনেকের ভীতি, আবার একই সঙ্গে কিছু ভুল আমরা করেই চলি। অথচ, এই ভুলগুলো তোমাদের প্রত্যেকের শুধরে নেওয়াটা খুব জরুরি।

প্রথমেই যেটা উল্লেখ করছি সেটা খুব 'কমন' ভুল। দশমিকের সংখ্যা পড়তে অনেকেই আমরা ভুল করে থাকি। উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে। যদি তোমাদের ১২.৩৪ সংখ্যাকে কথায় লিখতে বা বলতে বলা হয় তাহলে তোমরা কী ভাবে লিখবে বা বলবে? অনেকেই তোমরা বলো বারো দশমিক চৌত্রিশ। কিন্তু এটা অঙ্কের ভাষায় ভুল বলে ধরা হয়। দশমিকের পরের সংখ্যাটি আসলে ভগ্নাংশ সংখ্যা। সেটি সবসময় প্রতিটি সংখ্যা আলাদা আলাদা করে লেখাটাই নির্ভুল বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ, লিখতে হবে বারো দশমিক তিন চার।

এবার একটু জ্যামিতির কথা বলা যাক। বিন্দু কাকে বলে? কোনো ছাত্র বা ছাত্রী বলে, বিন্দুর কোনো সংজ্ঞা নেই, বিন্দু অসংজ্ঞাত। অনেকে বলে, দুটি সরলরেখার মিলনস্থলকে বিন্দু বলে। অনেক ছাত্র বা ছাত্রী বলে, বিন্দু এমন একটা জ্যামিতিক চিত্র যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা নেই। আমরা জানি একটি রেখা অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টি। অন্যভাবে বলা যায়, একটি রেখার অংশই বিন্দু। কিন্তুর বিন্দুর যদি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা না থাকে তাহলে অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টিরও দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা উচ্চতা থাকবে না। অর্থাৎ কোনো রেখাংশেরও দৈর্ঘ্য নেই। কোনো বিন্দুর যদি সামান্যতম দৈর্ঘ্যও না থাকে তাহলে রেখা বা রেখাংশই তৈরি হবে না। তোমরা যারা প্রথম জ্যামিতি করছো তাদের কাছে বিষয়টি জটিলতা তৈরি করতে পারে বলেই বিন্দুকে অসংজ্ঞাত বলা হয়।

অঙ্কতো অনেক হলো। এবার কিছু অন্য কথা। "The world is a musical band box"। এই কথাটি কে বলেছিলেন? সঙ্গীত নিয়ে বলা হলেও কথাটি বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাসের। সত্যি সত্যি অঙ্ক বা পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গীত বা মিউজিকের একটা যোগাযোগ আছে। একটি সমীক্ষায় বলছে, যারা মিউজিক নিয়ে সারাদিনের কিছু সময় কাটায় তারা অন্যান্যদের থেকে অঙ্কে ১৫ শতাংশ বেশি নম্বর পায়। ১৯৩৩ সালে একদল গবেষক একটি সমীক্ষা চালান। তাঁরা বলেন, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার মানসিকতা মোৎসার্ট শুনলে অনেকাংশেই বেড়ে যায়। এই খবরটি স্বাভাবিকভাবেই খবরের কাগজের শিরোনাম দখল করেছিল। একই সঙ্গে মোৎসার্টের সিডি এবং ক্যাসেট বিক্রিও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছালো যে আমেরিকার ফ্লোরিডায় প্রতিটি 'ডে কেয়ার' সেন্টারে একঘণ্টা মোৎসার্টের সিডি শোনানোর আইন জারি হয়ে গেল। দুর্ভাগ্যের বিষয় আর একদল গবেষক ব্রিটেনে ১০ থেকে ১১ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষা চালালেন। তাঁরা সেরকম কোনো পরিবর্তন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লক্ষ্য করলেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেছেন, মোৎসার্ট বা পপ মিউজিক নয়, যেকোনো ভালো লাগা গান বা গানের সুর মস্তিষ্কের কোষকে উজ্জীবিত ও উদ্দীপিত করে। সুতরাং পড়তে বা অঙ্ক করতে বসার আগে কিছুক্ষণ সময় তোমার ভালোলাগা কোনো গান বা যন্ত্রসঙ্গীতের সুর শুনলে পড়াশোনায় একাগ্রতা আসে।

কলিকাতা চলিয়াছে ...

আমাদের প্রাণের শহর এই কলকাতা। তিলোত্তমা, কল্লোলিনী কত না তার ভূষণ। কিন্তু তার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অনেক ইতিহাস। সেই ইতিহাসই তোমাদের সামনে ধারাবাহিক লেখায় তুলে ধরছেন অভিজিৎ দাশগুপ্ত।

১৩০০ শতকের শেষ দিকে বা ১৪০০ শতকের প্রথম থেকেই ইউরোপের রাজা, প্রজা সকলেই খেপে উঠলেন। কেন বলত? হ্যাঁ, ঠিক মনে আছে দেখছি। সবাই রান্নাকে সুস্বাদু করার জন্য ভারত বা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির মশলা চায়। সঙ্গে হিন্দুস্থানের সুতির কাপড় আর বহুমূল্য মসলিন। সুতরাং উপায় একটা বার

কর। কী উপায়? এগিয়ে এলেন রাজা থেকে রাজপুত্র, নাবিক থেকে বণিক। সকলেই ভাবতে শুরু করে দিল। আর আসবে নাই বা কেন বলত? কেউ বলতে পারবে এদের এগিয়ে আসার কারণ। ঠিক ধরেছ। নাবিক আর বণিক চায় পণ্য সরবরাহ করে অর্থ রোজগার করবে। রাজা আর রাজপুত্র চাইছেন সেই অর্থের খানিক কোষাগারে ফিরে আসুক রাজস্ব হিসেবে। সেই 'খানিক'-এর পরিমাণ কিন্তু চমকে দেবার মতো। সুতরাং শুরু হল তোড়জোড়।

ইতালি, স্পেন আর পর্তুগাল - এরা তিনটি দেশ এ ব্যাপারে প্রথম চেষ্টা শুরু করে। ইউরোপের এই তিনটি দেশের রাজা, রানিরা সংকল্প নিলেন যে করেই হোক এশিয়ায় পৌঁছাতে হবে। পৌঁছে যেতে হবে ভারতবর্ষে। সেই দেশের সর্বত্র নাকি সম্পদের ছড়াছড়ি। শুধু বুদ্ধি আর ক্ষমতা দিয়ে তুলে নেওয়াটুকু যা বাকি।

ইতালির রানি ইসাবেলা, পর্তুগালের রাজা হেনরি, রাজা ম্যানুয়েল সকলেই নাম লেখালেন এই প্রতিযোগিতায়। একদিকে তৈরি হতে লাগল দূর সমুদ্রোপযোগী জাহাজ আর অন্যদিকে সংগ্রহ শুরু হল সমুদ্রের জল-বাতাসের হাল হকিকত। মাঝে মাঝে দু-একজন নাবিক জাহাজ নিয়ে ভেসে পড়ে, কিছু দূর যায়, সমুদ্রের স্বভাব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তারপর দেশে ফিরে এসে তা সকলকে জানিয়ে দেয়। অন্য নাবিকরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে। আর কী? এবার ভেসে পড়লেই হল। খরচ-খরচার জন্য তো চিন্তা নেই, সে সবের জন্য রাজা আছেন। আছে ধনী ব্যবসায়ীরা।

১৪৯৭ সালের ৮ জুলাই। শনিবার। পর্তুগালের টেগস্ নদীর তীরে মানুষের ওপর মানুষ। কালো কালো মাথা। তারা যে একবার দেখতে চায় ঐ মানুষটাকে। ঐ যে যুদ্ধের মতন পোশাক গায়ে চড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নাবিক ভাস্কো-দা-গামা। স্বভাবের ভেতর একটা অধিনায়কের ভাব। দেখে মনে হয় এই বুঝি রেগে উঠবেন। কিন্তু মাথাটি ঠান্ডা। বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেন কাজের সময়।

রাজা ম্যানুয়েল এমন একজন মানুষকেই চাইছিলেন। শপথ বাক্য পাঠ করিয়ে নির্দেশ দিলেন জাহাজ ছেড়ে দেবার। হর্ষধ্বনির ভেতর একে একে জলে তরঙ্গ তুলে এগিয়ে যেতে থাকে সেন্ট গ্যাব্রিয়াল, সেন্ট র‍্যাফেল, বেরিও। এই নামগুলো কিন্তু কোনো মানুষের নয়। জাহাজের নাম ওগুলো। কত সুন্দর তাই না। ইচ্ছে হচ্ছে নাকি অমন একটা নাম নিজের পদবির সঙ্গে জুড়ে নিতে। তোমাদেরকেও এক একটা জাহাজ বলে মনে হয় আমার। বই-এর ব্যাগ থেকে ভবিষ্যৎ চিন্তা - দুই-ই কেমন সহজে বহন করে চলেছ তোমরা। তার সঙ্গেই থাকে কোন বন্ধু কথা বলল, কোন বন্ধু বলল না; কে টিফিন দিল; কে খেলতে নিল না - এর মতো হাজার চিন্তা। তাহলে বলো তো আমি কি ভুল বলেছি?

তা সেই জাহাজগুলো তো ধীরে ধীরে পুরো আফ্রিকা মহাদেশটা ঘুরে এগিয়ে এল ভারতে উপকূলে। সালটা ১৪৯৮, মে মাস। ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণের কালিকট বন্দরে পৌঁছে জাহাজ থামালেন। শুরু হল ভারতের নতুন ইতিহাস। এই ইতিহাস একদিকে শোষণের, অন্যদিকে নবজাগরণের। সেসব কথায় পরে আসা যাবে। বরং আমরা নজর দিই 'জামোরিন' রাজার রাজসভায়।

'জামোরিন' আসলে কোনো নাম নয়। উপাধি। মুসলমান বণিকরা উচ্চারণ করত 'সামরী'। ইউরোপীয়দের উচ্চারণে হয়ে যায় 'জামোরিন'।

তা অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে ভাস্কো-ডা-গামা রাজার সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তিনি যতটা আশা করেছিলেন তেমনটা হল না। স্বভাবত গামার মন একটু ভেঙে গেল। পর্তুগালের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা রাজা বলতেই চান না। এ এক দুশ্চিন্তার কারণ হল গামার। এদিকে 'জামোরিন'-এর এমন উদাসীন ব্যবহারে আরব বণিকরা তো খুব খুশি। বুঝতেই পারছ সে আনন্দের কারণ। এশিয়া-আফ্রিকা অঞ্চলে এতদিন ধরে আরব বণিকরাই বাণিজ্য করে এসেছে। তাদের থেকে পণ্য কিনত বিভিন্ন দেশের মানুষ। সুতরাং পর্তুগিজরা আসায় দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছিল। কিন্তু কালিকট রাজের আচরণে পর্তুগিজদের প্রতি গুরুত্ব প্রকাশ পেল না। আর তাতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন পুরোনো বণিক-নাবিকরা। আচ্ছা, এই ঘটনাটি জেনে তোমরা যারা খানিক বড়ো, এই সিক্স বা সেভেনে পড়ো, তারা কি ক্রুসেডের গন্ধ পাচ্ছ? মুসলিমদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের পুরোনো ঝগড়া। তা কিন্তু এত সহজে যাবার ছিল না।

গামাও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি কালিকটের সাতজন প্রধান হিন্দুকে জাহাজে আটক করলেন। রাজা আর কী করেন। বাধ্য হলেন। দু'মাস অপেক্ষার পর 'জামোরিন' একটি পত্র দিলেন ভাস্কো-দা-গামার রাজা ম্যানুয়েলকে দেবার জন্য। এতেই জয় হল ভাস্কো-ডা-গামার।

১৪৯৯, সেপ্টেম্বরে গামা ফিরে এলেন প্রিয় দেশের মাটিতে। সেখানে তখন ভাস্কোর নামে জয়জয়কার। রাজা ম্যানুয়েল এসে গামাকে নতুন উপাধি দিলেন **'Dom'** কিন্তু মন ভালো নেই গামার। নির্জনে থাকতে চান। একটা তীব্র যন্ত্রণা তাঁর কাজে-কর্মে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে যে। ভাই পাওলোরার আর ফেরা হয়নি দেশের মাটিতে। জাহাজ সেন্ট র‍্যাফেল-এর দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। দাদার সঙ্গে তিনিও এসেছিলেন এই ভারতবর্ষে। এখানকার মানুষজন, মন্দির, দেব-দেবী দাদার মতো তাঁর কাছেও অদ্ভুত ঠেকেছিল। তিনি ছিলেন দাদার দক্ষিণহস্ত। তাই দাদাও তাঁকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন।

ফিরে আসবার পথে সেই পাওলোরা হয়ে পড়লেন অসুস্থ। ভাইকে নিয়ে দ্রুত রওনা দিলেন গামা। কিন্তু ধরে রাখতে পারলেন না ভাইকে। অ্যাজোরেসে মৃত্যু হয় প্রিয় ভাইয়ের।

ক্ষুদে পাঠকের মতামত

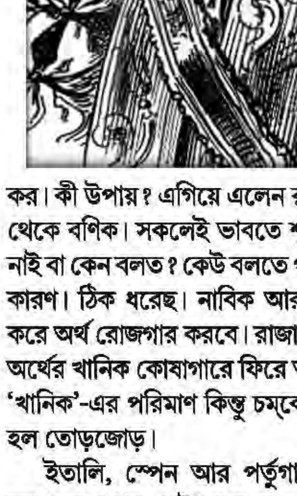
কিচির মিচির
১,০০,০০০ বছর পরে মানুষের মুখচ্ছবি
এ তুমি কেমন তুমি?

কষ্টকল্পনা ও কল্পবিজ্ঞান

১ লক্ষ বছর পর মানুষের কী রকম চেহারা হবে সেই নিয়ে বিজ্ঞানীরা নানারকম বক্তব্য রেখেছেন। অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন, মস্তিষ্কের আয়তন বৃদ্ধি পাবে। শরীর থেকে তাপ আটকানোর জন্য চুলের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে। আবার অনেকের মতে মানুষের এই বিবর্তন বাইরে থেকে বোঝা নাও যেতে পারে। তাঁরা বলেছেন যে, একজন ষাট বছরের মানুষের সঙ্গে একজন ত্রিশ বছরের মানুষের শরীরের দিক দিয়ে কোনো তফাৎ দেখা দেবে না। মানুষের চোখের দৃষ্টি হয়তো চিল বা বাজের মতো প্রখর হবে। মানুষের লোহিত কণিকা হয়তো দশ গুণ বেশি অক্সিজেন বহন করতে পারবে। লিভার যকৃৎ হয়তো আরো বেশি করে বিষাক্ত পদার্থ ছাঁকতে পারবে। এই সকল মতামত বিজ্ঞানীরা পোষণ করেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাঁদের এই ধারণাগুলি পুরোপুরি অনুমান নির্ভর, কোনো পরীক্ষিত সত্য নয়। ক্রমবর্ধমান উষ্ণায়ন ও পরিবেশ দূষণের ফলে ততোদিনে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এর জন্য একমাত্র দায়ি থাকবে মানুষ। নির্বিচারে গাছ কাটতে থাকায় পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমরা জানি, পৃথিবীর তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল। এই তিন ভাগ জলের মধ্যে মেরু অঞ্চলে জমা বরফ উষ্ণায়নের কারণে গলে গেলে জলের স্তর বৃদ্ধি পাবে এবং স্থল ভাগের অনেক অংশ জলে ডুবে যাবে। তাই আমার ধারণা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি পৃথিবী ধ্বংস নাও হয় পরিবেশ দূষণের কারণে ক্রমে বেড়ে চলা ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ কিংবা বিভিন্ন জটিল চর্মরোগ, স্নায়ুরোগ, মানুষের জীবনযাপনকে অতিমাত্রায় বিপন্ন করে তুলবে। আসলে আজ থেকে এক লক্ষ বছর পর কী পরিণতি অপেক্ষা করছে - তা আজকের দিনে বলা নিছক কষ্টকল্পনা নয় কি? এ নিয়ে কল্পবিজ্ঞানের গল্প হতে পারে বিজ্ঞানের গবেষণা নয়।

অর্কপ্রভ মল্লিক
শ্রেণি - চতুর্থ
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

লাল-রাজত্বে মঙ্গলযান

সমস্ত পুর্বপরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে মঙ্গলের কক্ষপথে ঢুকে পড়লো ভারতীয় মহাকাশযান 'মঙ্গলযান'। ২০১৩ সালের ৫ নভেম্বর পিএসএলভি-সি-২৫ রকেটে চেপে মঙ্গলযান যে যাত্রা শুরু করেছিল সে যাত্রায় কোনো ছন্দপতন হয়নি। যে দিন যাত্রাপথের অর্ধেকটা পাড়ি দিয়ে ফেলেছিল মঙ্গলযান অর্থাৎ ৯ এপ্রিল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র - ইসরো (ISR0 - Indian Space Research Organisation)। সেখানেই সামগ্রিকভাবে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল মঙ্গলযানের ধারাবাহিক অগ্রগতিতে। তখনই জানানো হয়েছিল যে মঙ্গলযান ইসরো'র বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এতটাই ঠিকঠাক পথে এগোচ্ছে যে এপ্রিল মাসে নির্ধারিত যাত্রাপথের আর সংশোধনের প্রয়োজন পড়বে না। যদিও পরে একটি যাত্রাপথ সংশোধন করা হয়েছিল।

যাই হোক, বিষয়টি তোমার আমার কাছে যতটা সহজ মনে হচ্ছে আদপে ততটা তো নয়ই, তার ধারে কাছেও নয়। এসো দেখে নেওয়া যাক সফল মঙ্গলযানের এই যাত্রাপথ মসৃণ করতে ঠিক কী কী করা হয়েছে বা কীভাবে এটিকে নিয়ন্ত্রণ করার মধ্য দিয়ে সঠিক পথে মঙ্গলযান এগিয়ে গিয়ে কাঙ্খিত গন্তব্যে পৌঁছাতে পেরেছে।

তোমাদের জানিয়ে রাখি, মহাকাশযানের যাত্রাপথ সংশোধনের বিষয়টিকে মহাকাশ অভিযানের পরিভাষায় বলা হয় 'ট্রাজেক্টরি কারেকশন ম্যানুভার'।

১১ জুন। ভারতীয় সময় বিকেল সাড়ে চারটে। মঙ্গলযানের ২২ নিউটন ক্ষমতাযুক্ত থ্রাস্টারকে ১৬ সেকেন্ড ধরে চালু রেখে এই সংশোধনের কাজটি প্রথম করা হয়। সবথেকে মজার কথা সেই সময় পৃথিবী থেকে মঙ্গলযানের দুরত্ব এতটাই তৈরি হয়েছে যে ইসরো'র নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে কোনো সংকেত পাঠালে তা মঙ্গলযানে পৌঁছাতে ৩৪০ সেকেন্ড সময় লাগছে। চলতি বছরের ৮ আগস্ট গন্তব্যের লক্ষ্যে যাত্রাপথের ৯০ শতাংশ অতিক্রম করে ফেলে মঙ্গলযান। তবুও সবাই তাকিয়ে ছিলেন ২৪ সেপ্টেম্বরের দিকে। কারণ টানা ৩০০ দিন বন্ধ থাকার পর ৪৪০ নিউটন ক্ষমতাযুক্ত আদৌ চালু হবে কিনা তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন বিজ্ঞানীরা। যদিও এই কাজটি করার আগে তার একটা মহড়া দিয়ে নিয়েছিলেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। অনেকটা ফাইনাল খেলতে নামার আগে সেমিফাইনাল বা নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে স্টেজ রিহার্সালের মতোই। সেই মহড়ার দিন নির্ধারিত ছিল ২২ সেপ্টেম্বর, ভারতীয় সময় দুপুর ২টো নাগাদ। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য সেই ইঞ্জিন চালু করে বিজ্ঞানীরা দেখে নিলেন আসল সময়ে অর্থাৎ ২৪ সেপ্টেম্বর চালু হবে কীনা।

তোমাদের জানিয়ে রাখা দরকার, যে ইঞ্জিনের কথা বলছি তা সম্পুর্ণভাবে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ এবং বিজ্ঞানীদের দক্ষতার একটি চূড়ান্ত নিদর্শন। এই ইঞ্জিনটির নাম 'ল্যাম' (LAM), পুরো কথা 'লিকুইড অ্যাপোজি মোটর'। বোঝাই যাচ্ছে, এই ইঞ্জিনটি তরল জ্বালানির সাহায্যে চলে। এই ইঞ্জিনটির বিশেষত্ব এই যে এটি নিরবিচ্ছিন্নভাবে চালু রাখতে হয় না। মহাকাশযান চলতে চলতে একটা কাঙ্খিত গতি লাভ করলে এই ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে আবার প্রয়োজন মতো বা ইচ্ছেমতো চালু করা যায়। একই সঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন, কঠিন জ্বালানি ব্যবহার করে যে ইঞ্জিন চলে তা একবার চালু করলে আর বন্ধ করা যায় না। ইনস্যাট-২ উপগ্রহে প্রথমবারের জন্য ল্যাম ব্যবহার করা হয়েছিল। ১৯৯২ সালের সেই প্রথম পরীক্ষায় সামান্য কিছু গণ্ডগোল বাদ দিলে ল্যাম সসম্মানে উতরে গিয়েছিল। তারপর থেকে ইসরো'র মহাকাশযানের সবসময়ের সঙ্গি ল্যাম। উল্লেখ্য ২৪টিরও বেশি উপগ্রহকে কক্ষপথে স্থাপন ও মহাকাশযানকে মহাকাশে পাড়ি দিতে সহায়তা করেছে ল্যাম। এরমধ্যে চন্দ্রযান-১-এর কথা তোমরা অনেকেই জানো। সেবার তিন সপ্তাহের মধ্যে ১০ বার চালু করা হয়েছিল ল্যামকে। এই চালু এবং বন্ধ করার সফলতার মধ্য দিয়েই চন্দ্রযান-ও তার নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিল। মঙ্গলযানের সফল হওয়ার পিছনেও এই ল্যামের গুরুত্ব অপরিসীম। ২২ সেপ্টেম্বরের আগে ৭ বার ল্যাম চালু করা হয়েছে। যদিও গতবছর ১ ডিসেম্বরের পর থেকে বন্ধই ছিল ল্যামের ইঞ্জিন। এই সময়ের মধ্যে তাপমাত্রার ব্যাপক হেরফের সইতে হয়েছে এই ল্যাম ইঞ্জিনকে। তাই চিন্তা ছিলো ঠিকঠাক চালু হবে তো ল্যাম?

যাই হোক সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে ২৪ সেপ্টেম্বর ল্যামের ইঞ্জিন চালু ছিল ২৪ মিনিট। এই সময়টুকুর মধ্যেই মঙ্গলযানের গতি কমিয়ে নিয়ে আসা হয় ১.১ কিমি/সেকেন্ডে। লালগ্রহের পাশে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরপাক খেতে থাকবে মঙ্গলযান। এই উপবৃত্তাকার পথে মঙ্গলযান থেকে

মঙ্গলের নিকটতম বিন্দুর দূরত্ব হবে ৩৬৫.৩ কিমি এবং দুরতম ৮০ হাজার কিমি। তোমরা ভাবছো কোনো গতিশীল পদার্থের গতি কমিয়ে আনা কী আর এমন শক্ত কাজ। ব্রেক চেপে ধরলেই হল। যখন কিউরিওসিটি রোভার মঙ্গলের মাটি ছুঁয়েছিল তখন তার গতি কমানোর জন্য থ্রাস্টার, প্যারাস্যুট কত কিছুই না ব্যবহার করা হয়েছিল। তবে যেহেতু মঙ্গলে নামবার কোনো ব্যাপার নেই মঙ্গলযানের তাই আছড়ে পড়ার ভয় মঙ্গলযানের না থাকলেও মঙ্গল ছাড়িয়ে অসীম মহাকাশে মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই গিয়েছিল। সেক্ষেত্রে ঠিকঠাক গতি কমিয়ে না আনতে পারলে পুরো 'মিশন'টাই মাটি। সবথেকে বড়ো কথা, ২৪ সেপ্টেম্বর মঙ্গলযান ছিলো মঙ্গলের আড়ালে। ফলে গতি কমিয়ে মঙ্গলের কক্ষপথে প্রবেশের কাজটি ঠিকঠাক হল কীনা তা জানার জন্য বিজ্ঞানীদের বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। যদিও তার আগে ১৪ সেপ্টেম্বর কক্ষপথে ঢোকার যাবতীয় নির্দেশ মঙ্গলযানের কম্পিউটারের তথ্যভাণ্ডারে সফলভাবে ভরে দিতে পেরেছিলেন বিজ্ঞানীরা। ইসরো'র অধিকর্তা রাধাকৃষ্ণাণ জানান, যদি একান্তই এই পরিকল্পনা সফল না হত তাহলে বিকল্পের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে মঙ্গলযানের আবর্তনের কক্ষপথ কিছুটা পাল্টে যেত।

৮৫২ কিলোগ্রাম জ্বালানি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল মঙ্গলযান। গত ২৭ আগস্টের হিসেব অনুযায়ী জ্বালানি অবশিষ্ট ছিল ২৯০ কিলোগ্রাম। কক্ষপথে ঢোকার সময় মঙ্গলযানের গতি কমাতে প্রায় ২৪০ কিলোগ্রাম জ্বালানি খরচা হয়ে যাবে। বাকি ৫০ কিলোগ্রাম জ্বালানি দিয়ে ট্রাজেক্টরি কারেকশন ম্যানুভার বা কক্ষপথের ত্রুটি সারানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ইসরো আগেই জানিয়েছিল যে কক্ষপথে ঢোকার কাজ মঙ্গলযান শুরু করবে মঙ্গলের ছায়াতে থেকে। ফলে সোলার প্যানেল থেকে কোনো শক্তি সে পাবে না। সম্পূর্ণটাই নির্ভর করতে হবে ব্যাটারি শক্তির ওপরে। অর্থাৎ শক্তির উৎস ৩৬ অ্যাম্পিয়ার আওয়ার লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি।

মঙ্গলযানের ভেতরে রয়েছে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরিক্ষার জন্য ৫টি যন্ত্র, যার ওজন ১৫ কিলোগ্রাম। মঙ্গলের কক্ষপথে পৌঁছে ইতিমধ্যেই মঙ্গলযান ছবি পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে। এই সফল মহাকাশ অভিযান ভারতকে পুর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা ও ইউরোপের পাশে জায়গা করে দিয়েছে। নাসা'র 'ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক' বা ইউরোপের 'ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি' অর্থ এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমাদের দেশের থেকে অনেক এগিয়ে থাকলেও ভারতের স্বাধীন চিন্তাভাবনায় অনেক কম অর্থে বেশি সাফল্য ওদেরকেও টেক্কা দিতে সমর্থ হয়েছে। এটা আমাদের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদদের মেধার চূড়ান্ত নিদর্শন। মঙ্গলযানের সাফল্য আমাদের দেশকে মহাকাশ বিজ্ঞানের শিখরে নিয়ে যাক এই কামনা ও আশা করি।

ভারতের মহাকাশ গবেষণার সাফল্য

নাম	তারিখ	উৎক্ষেপণের স্থান
আর্যভট্ট	১৯-০৪-১৯৭৫	সি-ওয়ান ইন্টারকসমস, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন
ভাস্কর-১	০৭-০৬-১৯৭৯	সি-ওয়ান ইন্টারকসমস, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন
অ্যাপেল	১৯-০৬-১৯৮১	অ্যারিয়ান, ইউরোপ
ভাস্কর-২	২০-১১-১৯৮১	সি-ওয়ান ইন্টারকসমস, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন
ইনস্যাট-ওয়ান বি	৩০-০৮-১৯৮৩	ক্রয় মহাকাশযান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
চন্দ্রযান-১	২২-১০-১০০৮	পিএসএলভি-সি ১১, ভারত

পুজোয় থাকবো পাড়াতেই

দুর্গাপুজো। এবারও প্রতি বছরের মতো ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখবো এটাই ভেবে ছিলাম। তাই বাবাকে মনের কথা খুলেও বলি। বাবা বললেন যে, 'বার বার একই জায়গায় ঘোরা, ভিড়ে গুঁতোগুঁতি করো, পথের পর পথ, মাইলের পর মাইল হেঁটে ঠাকুর দেখতে ভালো লাগছে না আমার।' তাই ঠিক করলাম এবার পুজোয় পাড়ায় থাকবো। এটা শুনে আমি যেমন দুঃখ পেলাম তেমন খুশিও হলাম। দুঃখের কারণ যেখানে আমার বন্ধুরা অনেক সুন্দর ঠাকুর দেখবে সারা রাত জেগে, সেখানে আমি মাত্র কয়েকটা আমার বাড়ির কাছের পুজো দেখবো। খুশির কারণ পাড়ায় দুর্গাপুজোর সময়ে একটা প্রতিযোগিতাতে অংশগ্রহণ করতে পারব।

ঐশী মুখোপাধ্যায়
শ্রেণি - ষষ্ঠ
পাঠভবন, কলকাতা

আমার পাড়া আমার কাছে পরিবারের মতো। আমরা এই পাড়াতেই জন্মেছি, বড় হয়েছি। আমারই বয়সি কিছু বন্ধুদের এবং পাড়াকে ঘিরেই গঠিত হয়েছে আমাদের 'শিশুসজ্জা', 'যৌবনের উপবন'। আমার কাছে আমার পাড়া এক নিত্য সহচরের মতো। মানুষ যেমনি তার নিত্য সহচরের সঙ্গে থাকতে চায়, তেমনি আমিও আমার পাড়ার সঙ্গে দুর্গোৎসব কাটাতে চাই। বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় থিমের পুজো হয়। যেখানে অপেক্ষা করে আনন্দ। একসঙ্গে ঘুরতে গিয়ে খাওয়া-দাওয়া, ঠাকুর দেখা ইত্যাদি। কিন্তু আমি আমার পাড়াতেই পুজোর সময় কাটাতে ভালবাসি। আমি সমস্ত পুজোটাই বন্ধুদের সাথে পাড়াতেই কাটিয়েছি। পুস্পাঞ্জলী, হইচই, প্রসাদ নিয়ে কাড়াকাড়ি —এর মধ্যেই তো পুজোর আনন্দটা। কোন পুজো সবথেকে ভালো এ নিয়ে একটা কৌতুহল থাকে। পাড়ার পুজোকে আরো ভালো করতে বিভিন্ন খাটাখাটনি করতে হয়। তবে যাই হোক, আমার পাড়ার পুজো সকলের চোখে শ্রেষ্ঠ হোক বা না হোক আমার কাছে শ্রেষ্ঠ, তথা সমস্ত কলকাতায় শ্রেষ্ঠ, কারণ সেখানে আমি আছি যে!

কৌস্তুভ চন্দ্র
শ্রেণি - সপ্তম
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়

আমার বন্ধুরা পুজোতে গ্যাংটক, পুরী, দিঘা ও কেরালাতে ঘুরতে যাবে। আমার পুজোতে কোলকাতা ছেড়ে কোথাও যেতে ভালো লাগে না। আমি আমার বাবা-মার সাথে ঠাকুর দেখতে যাই। 'চায়না-টাউনে' প্রতিবছর খেতে যাই। পুজোর একদিন আমি আমার দাদুন, দিদুন, ঠাম্মু, দাদাই, মিমি ও বোনের সাথে ঠাকুর দেখি। আমার বোনের মাত্র দেড় বছর বয়স, খুব মিষ্টি। বিজয়াদশমীতে আমার খুব মন খারাপ লাগে। সারা বছর দুর্গাপুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকি। আমার সবচেয়ে প্রিয় উৎসব হল দুর্গাপুজো।

কুর্চি চট্টোপাধ্যায়
শ্রেণি - তৃতীয়
আওয়ার লেডি কুইন অফ দি মিশন স্কুল

পুজো এলে মনের ভাবনাগুলো যেন সুগভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খায়। যেমন কিনা এবার কী করব পুজোয়, কী কিনব, কী খাব, বাপরে বাপ! লোকের ভিড়ে সদ্য পড়ে বেরোনো নতুন জামাটা কুচকে পুরনো জামার রূপ ধারণ করে। মার্কেটিং পুজোতে হবে সে তো স্বাভাবিক। পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে ঠাকুর দেখাটাও স্বাভাবিকই কিন্তু এই স্বাভাবিকতার স্বাদটাকে পরিবর্তন করে একটু অস্বাভাবিক করা দরকার। তাই গতবছর থেকেই আমার মন জেদ ধরেছে পুজোয় পাড়াতেই থাকতে হবে। আমিই বা আর কী করি, মেনে নিলাম আমার মনের কাছে হার। পাড়ার পুজোটা প্রতিবারের মতো এবারও খুব সাদামাটা। কিন্তু এই সাদামাটা সুরটাই আমায় এ বার টেনেছে। সপ্তমীর দিন একটি 'ডামসারাস' প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে অংশ নেয় মোট পাঁচটি পাড়া, যার মধ্যে আমরা একটি। অষ্টমীতে শাঁখ বাজানোর প্রতিযোগিতা। সত্যি এই আনন্দটা অন্য জায়গায় কোথায়! তবে আমরা ঠিক করেছি পরেরবার থেকে অষ্টমীতেই একটা ধুনুচি নাচ নাচব যা প্রতিবেশী পাড়াকে হিলিয়ে কুপোকাৎ করে দেবে।

কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না এই আনন্দের সময় কিছু ভাইবোন আমাদের এমন আছে যারা নতুন জামা পড়তে পারে না। তাই আমাদের কর্তব্য এদের মুখেও হাসি ফোটানো। সবকিছুর পরে আমি বলি আসছে বছর আস্থা বার হবে, বছর বছর আবার হবে। আমি আমার পাড়ার পুজোয় থেকে আনন্দ উপভোগ করব।

অনিন্দ্য সাহা
শ্রেণি - সপ্তম
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়।

আমার লেখার আগে মনে করিয়ে দিই গত বছর আমার প্রিয় বন্ধু অঙ্কুর থাইল্যান্ড দেশের ব্যাঙ্ককে গিয়েছিল সেবার পুজোটা তেমন ভাবে জমেনি। কিন্তু এবছর তা না। পুজো আসার আগেই খুব হইহুল্লোড়। সারা পাড়াটা বছরের সব কটা দিনের একঘেয়েমি কাটায় মাত্র কটা দিনে। অঙ্কুর আর আমি পঞ্চমীর দিন ভোরবেলা উঠেই স্নান করে আবৃত্তি অনুষ্ঠানে গেলাম সেখান থেকে এসে সারাটা দিন যা প্রত্যেক দিনের রুটিন মেনে চললাম। এরপর এল ষষ্ঠী। সারা পাড়ায় একেবারে সাজসাজ রব। সবাই ঝলমলে পোশাক পরে তৈরি হলাম প্রতিমা দর্শন করতে। সারাটা দুপুর বন্দুকের ক্যাপ ফাটানো মা এবং বাবারা শুনল। প্রায় দুপুর ১টার সময় বাড়ি ফিরলাম। স্নান করে খেয়ে দেয়ে খানিকটা গাঢ় ঘুম দিয়ে আবার বিকেল বেলা গেলাম পুজো মণ্ডপে এবার ৫টা থেকে ১০টা পুরো টানা খেলা আর খেলা। ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা লুচি বিতরণী হল। প্রায় ১২টা লুচি খেয়ে পেট আইঢাই করে বাড়ি গেলাম। এরপর এরকম ভাবেই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী কাটল। দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন-এর সময় একটাই কথা মনে এল সেটা হল 'পাড়ার পুজোটা হল আমার গর্ব' কারণ দুর্গা ঠাকুর যে শিউলি ফুলের মালা পড়েন তা কিন্তু তৈরি করি আমরাই, যে লুচি তৈরি হয় তার ময়দা কিন্তু মাখি আমরাই। ভাসানের সময় মনে পড়ে যায় প্রতিবছর 'পুজোয় থাকব পাড়াতেই'।

আর্য ভৌমিক
শ্রেণি - তৃতীয়
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

দ্বিতীয়াতেই স্কুলে পড়াশোনা লাটে তুলেছি। বেশ মজা, সারাক্ষণ বাড়িতে গল্প আর খেলা। আর স্কুল গেলেই শারদোৎসবের রিহার্সাল, তবে প্রথম দুটো পিরিয়ড ক্লাসে থাকতে হয়। তাও বেশ মজার, শারদোৎসবের পত্রিকা তৈরির নাম করে বসে পড়ি। কাজ করি না ছাই, কাজ করাই। বুদ্ধি আমার, করে অন্যরা।
বেশ মজায়ই কাটছে দিনগুলো পুজোর আগে এর থেকে ভালো কিছু আর আশা করা যায় না। মহালয়ার দিন লাইট লাগিয়ে দিল তার পরের দিন সাতটা থেকে বসেছিলাম লাইট জ্বালালো না। দ্বিতীয়াতেই লিখতেলিখতেহঠাৎ চোখ গেল, দেখি আলো জ্বলে গেছে আর সারা পাড়াটা আর পাশের ফ্ল্যাটগুলো আলোয় ভরে উঠেছে। প্রতিবার এত আলো লাগায় না, এবারই প্রথম। এবার বাবা বলেছে পুজোয় গাদা গাদা টাকা চাঁদা দিয়েও কোনোবার পুজো দেখা হয় না। প্রত্যেকবারই মামাবাড়ি আর বেড়াতে যাওয়া। যাই হোক, এবারে আয়োজনের বাড়বাড়ন্ত দেখে নো দার্জিলিং, নো মামাবাড়ি, ওন্‌লি পাড়া। এবারে আমাদের পাড়ায় হয়েছে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে আমরা গুরুত্ব দিয়েছি কয়েকজন মানুষকে, যাদের কাছে পুজো বলে কিছুই নেই, আছে কেবল দুঃখ। সব মিলিয়ে এবার এক নতুন অভিজ্ঞতা। কিন্তু 'বলো দুগ্গা মা কি জয়!' বলে তিনদিন কাটিয়ে নিয়ে তুহিন স্যারের ২০০টা অঙ্ক। ভেবেছিলাম পুজোর আগেই কিছুটা শেষ করবো কারণ পুজোয় নো পড়া ওন্‌লি মজা, কিন্তু তা আর হল কই!

স্বাস্তিক ঘোষ
শ্রেণি - সপ্তম
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়

দুর্গাপুজা বাঙালির প্রাণের উৎসব। গত তিনবছর কোনো না কোনো কারণে আমাকে কলকাতার বাইরে দুর্গাপুজার দিনগুলি কাটাতে হয়েছে। এই বছর আমি ঠিক করেছিলাম মা-বাবার সঙ্গে কলকাতাতেই দুর্গাপুজা কাটাব। দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে প্রতিটি বাঙালি যেভাবে উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে তেমনি আর কখনো দেখা যায় না। নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘ, মাঠে সাদা কাশফুলের দোলা, গাছ ভর্তি শিউলি ফুল দিঘিতে সদ্য ফোটা পদ্মফুল, মানুষের মধ্যে খুশির ছোঁয়া এই সবের মাঝেই আমি ষষ্ঠীর দিন থেকে ঠাকুর দেখা শুরু করি। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপে মণ্ডপে বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখে বেড়িয়েছি। জামা থেকে জুতো পুজোর সব কিছুই চাই নতুন। সঙ্গে ক্যাপে ভরা বন্দুক। দশমীতে বিদায়ের সুর। প্রতিমাকে জলে ভাসিয়ে মনে মনে বলেছি, 'আসছে বছর আবার এসো'।

স্বর্ণজিৎ মৈত্র
শ্রেণি - পঞ্চম
ক্যালকাটা বয়েজ স্কুল (সোনারপুর শাখা)

মনে হয় এই টপিকটা তাদের কথা ভেবে ঠিক করা হয়েছে, যারা পুজোর সময় পাড়ায় থাকে না, বেড়াতে চলে যায়। কিন্তু অধিকাংশ ছেলেমেয়েই পুজোর সময় পাড়াতেই থাকে। আমি থাকা বলতে রাত্রিবাস তো বোঝাচ্ছিই, এটাও বলছি যে, পাড়ার প্যান্ডেলেই সারা পুজোটা কাটিয়ে দেয়, এমন ছেলেমেয়েও আছে। কেউ আবার স্বেচ্ছাসেবক হওয়ায় পাড়াতেই থাকতে বাধ্য থাকে। কিন্তু আমি এই বিষয় নিয়ে লিখবই, কেন না আমি পুজোর সময় পাড়ায় থাকি না।

আমি ছোটোবেলা থেকেই পুজো কাটিয়েছি আমার মামার বাড়িতে। আমার মামার বাড়ির পুজো খুব বিখ্যাত পুজো। উত্তর কলকাতার টালা দুর্গোৎসব। যখন আমরা লেকটাউনে থাকতাম তখন মামার বাড়ি চলে আসতাম পুজোয়। কিন্তু যখন আমরা বাড়ি পরিবর্তন করে মামার বাড়ির পাড়ার পাশের পাড়ায় চলে আসি, তখনো পুরনো অভ্যাস ত্যাগ করতে পারিনি, স্কুলে ছুটি পড়লেই ব্যাগ গুছিয়ে চলে আসি মামার বাড়ি। সাইকেলের প্যাডেল যতটা সম্ভব জোরে দিয়ে এসে যখন পৌঁছাই , তখন যেন মনে হয় 'এটা আমার পাড়া'। এই পাড়ায় আমায় চেনে না বেশি কেউ, এই পাড়ার পুজো স্বেচ্ছাসেবকও নই আমি, অনেকটা স্বেচ্ছাতেই সারাদিন প্যান্ডেলে পড়ে থাকতে মোটেই ভালো লাগে না। ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখাই পুজোয় আমার প্রিয় কাজ। তাও এপাড়া যেন 'আমার পাড়া'।

কিন্তু , যদি আমায় পুজোটা নিজের পাড়াতেই কাটাতে হয়, আমার খুব মনখারাপ হবে। এত বছর পুজোয় মামাবাড়িতে থেকেছি, সেই দিনগুলোর স্মৃতি কুরেকুরে খাবে আমায়। সুখদায়ক স্মৃতি মানুষ বারবার ফিরে পেতে চায় জীবনে। তাই, আমার 'পুজোয় পাড়ায় থাকা' কখনো হবে কি না জানিনা, আমায় তো আর কেউ জোর করে আটকে রাখবে না পুজোয় পাড়ায় থাকার জন্য। তবে, 'কিচির মিচির' না থাকলে ভাবতেই পারতাম না কেমন হবে, যদি 'পুজোয় থাকব পাড়াতেই'।

প্রতীক বসু
শ্রেণি - সপ্তম
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন
আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়

শিবু আর ভুতেরা

অনেকদিন আগে একটা পুরনো জায়গায় একটা ঘর ছিল। একদিন একটা লোক ঐ জায়গাটাতে এল। লোকটার নাম শিবু। শিবু ওখানেই ঘরের ওপর বসল। তারপর ভাবল, আমি বাইরে গিয়ে একটু ঘোরাঘুরি করি। শিবু ঘরের সামনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে গেল। ওমা! সিঁড়িটা এক মিটার দুরে সরে গেল। শিবু এক মিটার দুরেই গেল। গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটা বাড়ি। শিবু বাড়ির দরজায় টোকা দিল। দরজাটা খুলে গেল। কিন্তু ভেতরে কেউ নেই। শিবু ভাবল, আমি আরোএকটু ভেতরে যাই। শিবু গেল কিন্তু কিছু দেখতে পেল না। শুধু দেখল, একটা চিঠি। চিঠির ওপর লেখা আছে, 'আপনার চিঠি'। শিবু চিঠিটা পড়ল। ভেতরে লেখা আছে, আমাকে যদি বাঁচাতে পারেন তবে আপনি দুটো হিরে পাবেন। শিবু ভাবল কোথায় আছে এই লোকটা? শিবু আরো ভেতরে গিয়ে দেখল লোকটা জেলে বন্দি। ছ'টা ভুত তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তখন শিবু লুকিয়ে লুকিয়ে জেলের পিছনে গেল। গিয়ে তার শক্তি দিয়ে জেলটাকে একটু ফাঁক করল। করে, লোকটাকে ইশারায় বেরিয়ে আসতে বলল। লোকটা দুটো হিরে দিল শিবুকে। আর লোকটা বলল, এই হিরেগুলোর মধ্যেই ভুতেদের প্রাণ আছে। আপনি ভুতেদের মারুন। বলে লোকটা চলে গেল। শিবু ভাবল, আমি কী করে ভুতেদের মারব?

হঠাৎ একটা আওয়াজ হল। সেই আওয়াজ থেকে আরও চারটে হিরে বেরিয়ে এল। হিরেগুলোর মধ্যে থেকে কেউ একটা বলল, আপনি যদি ভুতেদের মারতে পারেন তাহলে আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন। শিবু অবাক হয়ে বলল, আমি মারব কী করে? তখন হিরেগুলো বলল, তা আমরা জানি না। তারপর শিবু বাড়ি চলে এল। আসার পর, হিরেগুলো কাচ দিয়ে কেটে আগুনে পুড়িয়ে ফেলল। তখন ভুতেরাও শিবুর বাড়ি চলে এল। শিবু তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল আর ভুতেরা তাকে খুঁজতে লাগল। কিন্তু ততক্ষণে তো হিরে ছ'টা কালো হয়ে গেছে। তাই ভুতেদের প্রাণও শেষ হয়ে গেল।

শিবু তখন হাত জোড় করে বলল, সবার ভালো হোক এটাই আমি চাই। তারপর থেকে সবাই সুখে থাকতে লাগল।

অনুষ্কা চক্রবর্তী
শ্রেণি - দ্বিতীয়
ক্যালকাটা গার্লস হাই স্কুল

কচি পাতা

অসুরনাশিনীর পদধ্বনি

বহু বহু বছর আগে দেবী দুর্গার হাতে বধ হয়েছিল মহিষাসুর। যার অত্যাচারে ত্রিভুবন ছিল শঙ্কিত। অসুরবধের সঙ্গে সঙ্গে ধরিত্রীতে বেজে উঠেছিল মঙ্গলশঙ্খ। তবে বর্তমান সমাজে ফের আবির্ভাব হয়েছে বহু 'নররূপী' অসুরের। তাদের পাশবিক অত্যাচারে অতিষ্ঠ মানবজীবন, তাই আজ বসুন্ধরা গেয়ে ওঠে—

ধরিত্রী আজ ভীষণ রোখে
উঠছে জেগে উঠছে জেগে,
প্রলয় মেতেছে ভুবন
প্রলয়, প্রলয়, প্রলয়।।
অসুরদের অত্যাচারে
অন্যায় আর অবিচারে
প্রলয় মেতেছে
প্রলয় প্রলয় প্রলয়
সর্বনাশা পিশাচগুলো
রক্তশয়নে তারা শুলো
প্রলয় মেতেছে
প্রলয় প্রলয় প্রলয়
পাশবিকতার ভয়ের রণে
ধরিত্রী আজ প্রমাদ গণে
প্রলয় মেতেছে
প্রলয় প্রলয় প্রলয়
রক্তের বন্যা ছোটে
অসুরদের দম্ভ ফোটে
প্রলয়ে মেতেছে ভুবন
প্রলয় প্রলয় প্রলয়

সমগ্র মানবজাতি আজ দেবীর প্রার্থনায় মগ্ন, মানবজাতির কল্যাণের জন্য মাকে ফের রণরঙ্গিনী রূপ ধারণ করতে অনুরোধ জানায় তারা। তাই মা ফের চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন। ত্রিশূলাঘাতে বধ করেন সামাজিক অসুরদের।

মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ো
হাতে আবার ত্রিশুল ধরো
অসুর বধ সাঙ্গ করো
মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ো
সমাজ যে আজ দিশেহারা
তাদের দুঃখ করো সারা
প্রলয় নৃত্য শুরু করো
মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ো
সমাজের ঐ অসুরগুলো
সাবধান! তুমি তাদের বলো
রণরঙ্গিনী রূপ ধরো
মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ো
দেখাও মা তোমার শক্তি
সমাজকে তুমি দাও মুক্তি
দূর করো ওই পিশাচগুলো
মৃন্ময়ী মা চিন্ময়ী হয়ো

আমরা স্বপ্ন দেখতেই পারি এমন পৃথিবীর যার মধ্যে হিংসা নেই, দ্বেষ নেই। ভবিষ্যতে মা দুর্গা নিশ্চয়ই কোনো একদিন অসুর বধ করবেন আর আমাদের সমাজ ফের হয়ে উঠবে সুস্থ। তাই মাতৃবন্দনায় গেয়ে উঠবে সমগ্র মানবজাতি—

মুক্তির আলোয় পেয়েছি
তোমার পদধ্বনি,
এই সমাজই তো চেয়েছি
মঙ্গলশঙ্খ শুনি,
অসুরগুলো সমাজ ছাড়া
আনন্দের আজ বইছে ধারা
অসুরবধের সঙ্গে পেলাম
মানুষদেরই সাড়া
মুক্তির আলোয় পেয়েছি
তোমার পদধ্বনি
মাগো তোমার এত মহিমা
ধরিত্রী আজ মাহামায়া
অসুরগুলো পেয়েছে দন্ড
ধন্য তোমার মায়া
মুক্তির আলোয় পেয়েছি
তোমার পদধ্বনি,
তোমারই নাম মা দুর্গা
দুর্গতিনাশিনী
তোমার শক্তি দিল মুক্তি
শুনি পদধ্বনি
মুক্তির আলোয় পেয়েছি
তোমার পদধ্বনি।।

রাজদীপ দত্ত
শ্রেণি - সপ্তম
বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন
আশ্রম হাই স্কুল

পুজো

পুজো মানে আশা,
পুজো মানে সবার জন্য
অপার ভালোবাসা।
পুজো মানেই কাশ,
আর পুজো মানেই চাঁদার গুঁতো,
রঙিন আলোর বাহার,
পায়ে সবার নতুন জামা,
আর পেট ভরতি খাবার।
পুজো মানেই জোরসে মাইক,
আর পুজো মানেই পটকা
এসব কবে বন্ধ হবে?
তা নিয়ে মনে লাগে খটকা।

অরুণাভ মুখোপাধ্যায়
শ্রেণি - পঞ্চম
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়

বাবুই আর আমি

সকালবেলায় জানালা দিয়ে মুখ বারিয়ে দেখি,
বেগুন গাছে বাবুই পাখি বুনছে বাসা ওকি!
বাসা খানি বীণার মতো দেখতে ভারি খাসা,
কাঠকুটো আর পাতা দিয়ে শক্ত করে ঠাসা।
এমন সময় ঝোরো হাওয়া বয়ে গেল প্রখর ঝরে,
খসে পড়ল বাবুইয়ের বাসা ঝুল, ঝুল করে।
বাবুই কাঁদে আর বলে,
কী করব আমি?
যখন আমি ডিম পারব,
রাখব কোথায়? বল তুমি।
আমি বললাম, কেঁদো না, কেঁদো না।
এখনি কিছু করছি,
ঘরের থেকে সুতো এনে,
তোমার বাসা বাধছি।
এই না বলে সুতো এনে তার বাসা বাঁধলাম। 'নাও তোমার বাসা বাধা হয়ে গেছে' আমি বললাম, বাবুই আমায় ধন্যবাদ জানাল আর আমার কথাটি ফুরল।

রাজশ্রী সাউ
শ্রেণি - চতুর্থ
দি ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুল

শ্যামা পুজো

শ্যামা পুজো এল আজই
সারাদিন আজ ফুটছে বাজি
সবাই আজ এতেই মেতে
খেতে কেউ হচ্ছেনা রাজি।
আকাশ আজ আলোকময়,
সবাই আজ আনন্দময়,
আজ সবার মনে হচ্ছে
সব সময় এতেই মাতি।
তুবড়ি, চড়কি, তারাবাতি
রকেট নিয়ে মাতামাতি,
আজ সবার মনে হচ্ছে
এ যেন অন্য সময়।

আত্মদীপ সেনগুপ্ত
শ্রেণি - চতুর্থ
মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়

আমরা দেবো একটি বিষয়। সেই বিষয়ের ওপর ২০০ শব্দের মধ্যে লিখে আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দাও। চুপিচুপি বলে রাখি, বাবা-মা বা বড়োদের সাহায্য নিলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পেরে যাবো। লেখা হলেই আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দাও। খামের ওপর লিখবে -

মেলে দিলেম ইচ্ছেডানা
প্রযত্নে - **কিচির মিচির**, ৯, কৈলাশ ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১

পাঠাতে পারো ই-মেল করেও। আমাদের ই-মেল - kichirmich-irkol@gmail.com। লেখা পাঠাতে হবে ফুলস্কেপ কাগজের একপিঠে। দু'পাশে যথেষ্ট ছাড় দিয়ে ২৪ অক্টোবর-এর মধ্যে। নাম, ফোন নম্বর, ঠিকানা, বিদ্যালয়ের নাম, শ্রেণি পরিস্কার করে উল্লেখ করবে।

প্রতিযোগিতার বিষয় :
ছুটির পরই সেই পরীক্ষা!

বরানগর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

দেবীবরণ

১) শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধনের পর চোখ বোলাচ্ছেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বামী ঋতানন্দজী মহারাজ।
২) উদ্বোধনের পর বিদ্যালয়ের দেওয়াল পত্রিকার সামনে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বামী ঋতানন্দজী মহারাজ এবং প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক স্বামী শশিশেখরানন্দ মহারাজ।
৩) দেবীবরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণরত বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বামী ঋতানন্দজী মহারাজ।

৪) অনুষ্ঠানে ছাত্ররা। রয়েছেন প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক স্বামী শশিশেখরানন্দ মহারাজ।
৫) বিদ্যালয় পত্রিকা 'সাদা মেঘের ভেলা' উদ্বোধনের পর বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের সম্পাদক স্বামী ঋতানন্দজী মহারাজ এবং প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক স্বামী শশিশেখরানন্দ মহারাজ।
৬) দেবীমূর্তির সামনে ছাত্রদের সঙ্গে প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক স্বামী শশিশেখরানন্দ মহারাজ।
৭) দেবীদুর্গার বেশে বিদ্যালয়ের এক ছাত্র।
৮) বিদ্যালয়ের ছাত্ররা দুর্গা পরিবারের সদস্য/সদস্যার রূপে।

সব ছবি *দেবাশীষ দাস*।

আঁকি-ঝুঁকি

হাওড়া সরস্বতী ক্লাব আয়োজিত সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতায় চারটি বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারীদের আঁকা ছবি।

পৃথ্বীশ বাগ
বিভাগ - ক, শ্রেণি - প্রথম,
বোধদয়, দেশপ্রাণ শাসমল রোড, হাওড়া - ১

ঋতশ্রী রায়
বিভাগ - খ, শ্রেণি - তৃতীয়,
বিমলাদেবী প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাওড়া

সুদীপ্ত মণ্ডল
বিভাগ - গ, শ্রেণি - ষষ্ঠ,
শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, হাওড়া

তিসা পারাল
বিভাগ - ঘ, শ্রেণি - অষ্টম,
তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, হাওড়া

কিচির মিচির-এর পক্ষে রিমা ঘোষদত্ত কর্তৃক ৯, কৈলাস ব্যানার্জি লেন, হাওড়া - ৭১১ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং তাজ এন্টারপ্রাইজ, ৬ মণীন্দ্র মিত্র রো, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : সুদীপ্ত চক্রবর্তী।
E-mail : kichirmichirkol@gmail.com, সম্পাদনা ও বিজ্ঞাপন : ৯৮৩০০৭৭২০৫/৯৩৩০৮০৮৯০০, বিপণন : ৮০১৭১৫৫৪১৭ Dl. No : 70/ dt.22.08.2014